দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন

নজমুল চৌধুরী

দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন

(ছোটগল্প সংকলন)

নজমুল চৌধুরী

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন

(ছোটগল্প সংকলন)

নজমুল চৌধুরী

প্রকাশক

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১,

প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ২০০১

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ফোন ঃ ৭১১০৫৬২

প্রচ্ছদ

আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ সাদা কাগজ ৬০.০০ টাকা

অফসেট কাগজ ১০০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

৭২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

DUSSAPPNER PADACHINNA (A Collection of short stories) By : Nazmul Choudhury, Published by: Muhammad Nur Ullah, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000,
Price : Tk. 60.00 US $ 2/-

ISBN- 984-493-063-4

www.pathagar.com

উৎসর্গ

গুলশান-কে
১৮তম বিয়ে-বার্ষিকীতে
নজমুল চৌধুরী
০৪/০২/২০০১ইং

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

নজমুল চৌধুরী রচিত দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন গ্রন্থে 'অন্যগ্রহের ঠিকানায়', 'আঁধারের রূপ','যবনিকার অন্তরালে', 'দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন','দারুচিনি দ্বীপে', 'প্রজাপতি মন', এবং 'মাদারীপীরের জটা' নামে সাতটি গল্প সমাহৃত হয়েছে। একমাত্র 'আঁধারের রূপ' ছাড়া অবশিষ্ট ছয়টি গল্পেই প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবনযুদ্ধের অত্যন্ত রূঢ় বাস্তব ছবি তাঁর সুদক্ষ উপস্থাপনায় মূর্ত হয়েছে।

সহজ সরল ভাষায় রচিত অধিকাংশ গল্পে বাংলাদেশের খেটে খাওয়া অভাবী মানুষ কিভাবে জীবিকার সন্ধানে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, ঝুঁকিপূর্ণ পেশা এবং মন-দৈহিক চাহিদার টানা-পোড়নে ক্ষত বিক্ষত হয় তারই বর্ণনা পাই। লেখক প্রায় দুই যুগ ধরে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন। প্রবাস জীবনের প্রচুর অভিজ্ঞতার উপাদানে তাঁর স্মৃতি ভান্ডার সমৃদ্ধ। এ কারণে প্রবাস জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত এ গ্রন্থের গল্পগুলো খুবই উপভোগ্য হয়েছে। পাঠককে ধরে রাখার এক অদ্ভুত মোহনীয় লিখনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন লেখক কোন কোন গল্পে।

গল্পের সূচনায় দু'চারটি বাক্যেই তিনি পাঠককে মূল কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট করেন। এ আকর্ষণই পুরো গল্পটি পড়তে পাঠককে অনুপ্রাণিত করে।

গল্পের সমাপ্তিও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। অতৃপ্তি, বেদনা বা সমাপ্তির আকস্মিকতা কিছু কিছু গল্পকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। যেমনঃ

গল্পের সূচনা

ক. "অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত বিমানের টিকেট কনফার্ম করতে পেরেছে কুতুব। মতিঝিল বিমান অফিস হতে বেরিয়ে প্রয়োজনীয় কেনাকাটার কাজ গুলিস্তানের মোড় হতে সেরে নেয়। আগামীকাল ফ্লাইট সকাল এগারটায়। সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে সময় থাকতে।"- অন্য গ্রহের ঠিকানায়।

খ. "আজ স্রেফ আপ্‌কা চিঠি আয়া সাহাব। পেপসি পিলাও। হাসতে হাসতে ইন্ডিয়ান অফিসবয় ইকবাল চিঠিখানা এগিয়ে দেয় সাদেকের হাতে।"- দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন।

গ. চাকরি নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটে চলেছে মাহমুদ আজ প্রায় দু'বছর ধরে। দারুণ হতাশা নিয়ে প্রতিদিন ঘরে ফেরে। ভাগ্যিস, পারিবারিক দায়দায়িত্ব নেই। একমাত্র ছোট ভাইটিও গত বছর ম্যালেরিয়ায় পটল তুলেছে। পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তিও অবশিষ্ট নেই। যা ছিল তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ডিগ্রি নিতে গিয়ে শেষ। সকাল বিকেল ছাত্র পড়িয়ে মেসের খরচ বহন করতে হয় মাহমুদকে। কিন্তু এভাবে আর কত দিন?" -আঁধারের রূপ।

www.pathagar.com

গল্পের সমাপ্তি

ক. "বিকট শব্দ করে আবারও বিদ্যুৎ চমকালো। মজিদ মিয়ার হাতের বুভুক্ষু যন্ত্রটি প্রতিশব্দে গর্জে উঠল। লুটিয়ে পড়ে হুমড়ি খেয়ে একটি রক্তাক্ত দেহ অন্ধকারে লাইট পোস্টের নিচে। মেলে থাকা স্থবির দুটো চোখ যেন খুঁজতে থাকে আঁধারের সত্যিকারের রূপ"-আঁধারের রূপ

খ. "কোন উত্তর না দিয়ে এলোকেশী রীতা পাগলিনীর মত সন্ধ্যার অন্ধকারে নতজানু হয়ে মাটিতে খুঁজতে থাকে এক অতি পরিচিত পদচিহ্ন।" 'দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন'

'দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন' গল্পের নায়ক সাদেক। স্ত্রী রীতাকে নিয়ে গড়ে ওঠা ওদের মধুর দাম্পত্য জীবনে কন্যা বাঁধনের আবির্ভাব তাদের জীবনকে আরও স্বপ্নীল এবং অর্থবহ করে তোলে। কিন্তু একটি তুচ্ছ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সাদেক একদিন রীতাকে তালাক দেয়। এ অনাকাঙ্খিত আকস্মিক অবাঞ্চিত আচরণের জন্যে সে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু রীতাকে নিয়ে তো আর ঘর বাঁধা যায় না। তাই বাঁধন ও রীতার ভবিষ্যৎ সুখের চিন্তায় তাড়িত হয়ে বন্ধু মাসুদের কাছে রীতাকে বিয়ে দেয়। রীতার পেটে মাসুদের সন্তান। প্রবাস জীবনে রীতা ও মাসুদ পরস্পরের জন্যে ভালবাসার দাবানলে প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ হতে থাকে, কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতার দেয়াল ভেঙ্গে পুনর্মিলনের তো কোন সুযোগই নেই। তাই একদিন বাঁধনকে রীতার কাছে রেখে সে চলে যায় দূরে, বহুদূরে। রেখে যায় বন্ধু মাসুদ ও রীতার কাছে তার একমাত্র কন্যা বাঁধন, সমস্ত সম্পদ আর এই চিঠি।

" মাসুদ! বন্ধু আমার! তোদের দু'জনের উদ্দেশ্যে আমার এ পত্র লেখা। হাতে সময় খুবই অল্প। বাঁধন নিশ্চয়ই তার মাকে পেয়ে খুশি। তোদের কাছে আমার কলিজার টুকরো বাঁধনকে রেখে গেলাম। আজ হতে তুই তাকে নিজের মেয়ে বলেই জানিস। লেখাপড়া শিখিয়ে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিস্। তোদের দু'জনকে আমার চাকরি জীবনের গচ্ছিত ব্যাংকের সমূদয় টাকা ও যাবতীয় স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি উপহার হিসাবে দিয়ে গেলাম। এর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র রইল।

ওদের দু'জনের পাসপোর্টে একজিট লাগানো হয়েছে। সাথে টিকেটও রইল। দেশে গেলে সম্পত্তির কাগজপত্র ঠিক করে আসিস।

তোর বোন সেতুকে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে আসবি। আর মাত্র তিন চার ঘন্টার ভেতর আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি চিরতরে-দূরে, ব-হু-দূ-রে। আর কোনদিন দেখা হবে না বন্ধু।

"তোর বাসার সামনে রয়েছে যে আচ্ছাদিত পর্বত, এটির ঠিক উপরে দেখবি একটি উজ্জ্বল তারা। মধ্যে মধ্যে মেঘ এসে তাকে ঢেকে দেয়, কিন্তু তার উজ্জ্বল জ্যোতি ঠিকরে বেরিয়ে আসে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। আমি ঐ মেঘে ঢাকা তারার মতই তোদের তিনজনের শুভ কামনা করে যাব দূর থেকে। তোরা সুখে থাক বন্ধু।"

"চিঠি পড়ে অশ্রুসিক্ত মাসুদের বুক থেকে বেরিয়ে আসে পাথরচাপা এক দীর্ঘনিঃশ্বাস। ভেঙ্গে পড়া রীতাকে টেনে নিয়ে আসে বাইরে। পর্বতশৃঙ্গের ঠিক উপরে ঝিলমিল মেঘে ঢাকা তারাটির দিকে চেয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, "সাদেককে ওখানেই মানায়, রীতা"!

বন্ধুপত্নী রীতাকে পেয়ে মাসুদও সুখী হতে পারেনি। এ ব্যাপারে রীতা জানাচ্ছে, "বিশ্বাস কর সাদেক! তোমার ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে সে আজকাল এমনই খামখেয়ালী হয়েছে যে, জীবনের সব খেই যেন হারিয়ে ফেলেছে। আমি ওকে সমগ্র শক্তি দিয়ে ধরে রেখেছি, নতুবা সে অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে এতদিনে নিঃশেষ হয়ে যেত। ওকে বুঝিয়েছি, বিধি মোতাবেক আমি তোমার স্ত্রী। সে অধিকারে তুমি আমার উপর অধিকার খাটিয়েছ, তাতে তোমার ভুল হয়নি, বরং তুমি যা করেছ তা ধর্মের বিধি মোতাবেক অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এতে তার অপরাধবোধ কিছুটা হালকা হয়েছে।" -দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন।

এ গ্রন্থের একাধিক গল্পে মানুষের আর্থিক দৈন্যের সুযোগ নিয়ে সহজ-সরল মানুষকে অভিনব পন্থায় অবৈধ অর্থ উপার্জেনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে লেখকের কুশলী হাতের মায়াবী উপস্থাপনায়। যেমন, 'আঁধারের রূপ' গল্পের নায়ক বেকার মাহমুদ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পড়ে চাকুরীর জন্যে ইন্টারভিউ বোর্ডের অজানা গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

"মাহমুদের মনে হল, সিঁড়ি বেয়ে সে নিচের দিকে নামছে। চোখটা বুঁজে আসছে অসারতায়। মনে হচ্ছে অন্ধকার একটি কক্ষের মধ্য দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। দু-একটি ইঁদুর ছুটতে গিয়ে যেন হোঁচট খেলো। কিছু সময়ের ব্যবধানে আরেকটি দরজা খোলার শব্দ হল।

অন্ধকারে ভয় পাচ্ছেন স্যার ? লোকজনতো এহানে থাহে না, তাই আইন্ধ্যার। দাঁড়ান, এহনই লাইট জ্বালামু। আইন্ধ্যার দূর অইয়া যাইব।

সুইচ টিপার শব্দ হতেই নিয়ন লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে ঘরটি। সোফাশোভিত কার্পেট মোড়া কক্ষটি। পরিপাটি করে সাজানো।

এহানে বইয়া থাহেন স্যার। ফাদার আইলে আপনারে তলব করব। আমার কাম শেষ। এহন আসি স্যার।

মাহমুদের মাথা ঘুরছে। চোখের সামনে একটি লাইট হাজারো লাইট হয়ে জ্বলছে।

মাইক্রোফোনের আওয়াজে চমকে উঠে মাহমুদ। কে যেন ভারিক্কি গলায় বলে উঠল, ডান দিকের ওয়ালের উপর যে ছোট্ট লাল লাইটটি বিন্দুর মত জ্বলছে, ঠিক তার নিচে এসে দাঁড়ান। দরজা ফাঁক হলে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ভেতরে ঢুকে পড়বেন।

মাহমুদের বুঝতে অসুবিধা হয় না টি,ভি ক্যামেরার মাধ্যমে তার গতিবিধি কেউ লক্ষ্য করছে ভেতর হতে। মাথাটা চেপে ধরে হুকুম তামিল করল সে শরীরে এক প্রচন্ড শক্তি নিয়ে।

ভেতরে ঢুকা মাত্র ঠিক তার সামনে দেখতে পেল পিঞ্জরাবদ্ধ এক ময়না। ডানা ঝাপটিয়ে ঘাড় কাত করে দু-কান ফুলিয়ে বলল, যীশুর কৃপায় আপনার মঙ্গল হোক। সামনে বাড়ুন, ফাদার সায়মন আপনার অপেক্ষায় আছেন, কথা নয় কাজ, শুভরাত্রি।

একটা পাখি যে, এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে তা স্বকর্ণে শুনে মাহমুদের বিস্ময়ের ঘোর কাটে না।"

অবশেষে মাহমুদের চাকুরী হল। অর্থ পেল। বেকারত্ব ঘুচল। মালিকের হয়ে

www.pathagar.com

ব্যাঙ্কে সে প্রতিদিন প্রচুর টাকা জমা দিত। কিন্তু একদিন ছুটি কাটাতে এসে যখন জানতে পারে যে, অসহায় শিশুকে লেংড়া-খোঁড়া বানিয়ে তার কর্মকর্তা যে অর্থ উপার্জন করে সে অর্থই সে এতদিন ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসছিল। অবশেষে প্রতারক মালিকের সাথে এনিয়ে শেষ বুঝা পড়া করতে চেয়ে নির্মমভাবে নিহত হয় দালাল মজিদ মিয়ার হাতে। তার মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ে মাহমুদের মাথায়। বাইরে ঝড়ের তান্ডব শুরু হয়েছে ততক্ষণে। রাস্তার বাতি নিভে গেছে। ত্রস্তপদে মজিদ মিয়ার সামনে এগিয়ে যায় সে। বিদ্যুতের আলোয় ভুত দেখার মতই চমকে উঠে মজিদ মিয়া।

স্যার আপনে ? হ্যাঁ, আমি! কিছু লুকাতে চেষ্টা করো না আর। ফাদারের কাছে নিয়ে চল আমাকে। শেষ বুঝাপড়া করতে হবে ঐ শয়তানটার সাথে।

মজিদ মিয়ার হাত দ্রুত চলে যায় তার নীল সার্টের পকেটে। বলে, ফাদারের সাথে শর্তের কথা ভুইল্যা গেছেন ? শর্তভঙ্গকারীকে আল্লাহ একদম পছন্দ করেন না।

কি ? শয়তানের মুখে আল্লাহর নাম ! মজিদ মিয়ার দিকে দু'পা এগিয়ে যায় মাহমুদ। অজান্তে দ'হাতের মুষ্টি হয় সুদৃঢ়।

কোথায় যেন বাজ পড়ল ভীষণ শব্দে। অন্ধকারের বুকে বিদ্যুতের আলোয় মজিদ মিয়ার চোখ দুটো জ্বলে উঠে চিতাবাঘের ন্যায়। ফাদারের কাছে যাবেন, সে সুযোগতো অইবো না মিয়া-ভাই ?

বিকট শব্দ করে আবারো বিদ্যুৎ চমকালো। মজিদ মিয়ার হাতের বুভুক্ষু যন্ত্রটি গর্জে উঠল। লুটিয়ে পড়ে হুমড়ি খেয়ে একটি রক্তাক্ত দেহ অন্ধকারে লাইট পোস্টের নিচে। মেলে থাকা স্থবির দুটো চোখ যেন খুঁজতে থাকে আঁধারের সত্যিকারের রূপ।-আঁধারের রূপ।

'মাদারীপীরের জটা' গল্পেও 'আঁধারের রূপ' গল্পের মতই এক ধরনের রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন লেখক। গল্পের নায়ক টুটুল পাত্রীর অনুসন্ধানে জটাধারী যুবতীকে অনুসরণ করে এগিয়ে যায় পর্দাঘেরা অন্ধকার এক প্রকোষ্ঠের দিকে।

" ভারি কালো পর্দার অন্তরালে মোমবাতির মৃদু আলোয় কক্ষটিতে এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ডানদিকের টানা বারান্দার দেয়ালে আঁকা বিরাট আকারের মাদারী গাছটিকে আজ জীবন্ত মনে হয়। লাল লাল ফুলে ছেয়ে আছে গাছটির সমস্ত শাখা প্রশাখা। গুচ্ছ গুচ্ছ চুল জটলা পাকিয়ে যেন লেপটে আছে গাছটির সারা অঙ্গে। ডালে ঝুলছে এক মস্ত বড় অজগর। আগুন ঝরানো লাল দু'টো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে টুটুলের দিকে। যেন এখনই ফোঁস ফোঁস শব্দে তার মাথা বরাবর ঝাঁপ দেবে, বিষাক্ত ছোবলে জ্বালিয়ে দেবে তার সারা অঙ্গ। শিরশির করা এক প্রতিক্রিয়া বয়ে যায় টুটুলের সারা দেহে।

জুতো খুলে ভেতরে প্রবেশ করুন। যুবতীটির দিকে একবার তাকিয়ে পর্দা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে টুটুল। হৃৎপিন্ডটি ঘড়ির পেন্ডুলামের মত শব্দ করে দুলছে এক অজানা আশঙ্কায় অথবা উত্তেজনায় যা টুটুল নিজেও জানে না। ঘরটির অভ্যন্তরে লাল

www.pathagar.com

চাঁদোয়ার নিচে কালো পাতলা পর্দার ওপাশে মোমবাতির মৃদু আলোয় বসে আছে একটি নারীমূর্তি। ফোনে ফিস ফিস করে কার সাথে কথা বলছে। দু'পাশে রাখা কোলবালিশের মধ্যখানে নারীমূর্তিটি এবার একটু নড়ে উঠে। তার অদ্ভুত কণ্ঠ হতে পাক খেতে খেতে শব্দতরঙ্গ বেরিয়ে আসে পর্দা ভেদ করে-তুমি যার খোঁজে আমার কাছে এসেছো, সে তো তোমারই দুয়ারে অপেক্ষমান বাবা! দূরে আছ বলে এতদিন ওকে তোমার চোখে পড়েনি। যাও, ঘরে ফিরে যাও। মাদারীপীর তোমার মনের কথা জানেন, তিনিই তোমাকে ওকে খোঁজে পেতে সাহায্য করবেন। এখান হতে সোজা ঘরে ফিরে যাও, কাল সকাল পর্যন্ত কারো সাথে অযথা কথা বলো না। তোমার মায়ের এমন একটি কনে পছন্দ হবে যে হবে তোমার জন্যে উৎকৃষ্ট। তবে বাপ! মা হারিয়েছে বলে মেয়েটিকে যদি অবজ্ঞার চোখে দেখো, তাহলে ফল হবে ভয়াবহ। আর দেরী করো না বাবা! ঘরে ফিরে যাও।"

নিম্নবিত্ত বাঙ্গালী প্রবাস জীবনের অনাত্মীয় অচেনা রূঢ় পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে কিভাবে জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে তার বাস্তব চিত্র আঁকা হয়েছে 'অন্য গ্রহের ঠিকানা' গল্পে। গল্পের নায়ক কুতুব ভিটে-মাটি বন্দক রেখে সৌদি আরব যায় অর্থ উপার্জন করতে। আবু আম্মারার গৃহভৃত্যের চাকুরি পেয়ে তার প্রবাস জীবন ভালই কাটছিল। ওঁর মেয়ে নূরহানার প্রেমে পড়ে কুতুব। দু'জনে ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর। একদিন আততায়ীর শরাঘাতে আবু আম্মারার মৃত্যু হয়। এ জন্যে দায়ী করা হয় কুতুবকে। বিচারে সে নিরপরাধ প্রমাণিত হয়। কিন্তু অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানের কারণে সে সৌদি আরব ছাড়তে বাধ্য হয়। প্রেমিকা নূরহানার কাছ থেকে বিদায় নেয় এ বলে যে, পুনরায় সে বৈধ কাগজপত্র নিয়ে তার কাছে ফিরে আসবে। এ বিদায়দৃশ্যের বর্ণনা এবং বাঙ্গালী যুবকের প্রতি আভিজাত্যের উত্তরাধিকারী এক সৌদি বালিকার হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসার কুশলী বর্ণনায় গল্পটি এক ব্যতিক্রমধর্মী মাধুর্যলাভ করেছে। যেমন, নূরহানা কুতবকে বিদায় দান কালে বলেছে,

"আমি সে অপেক্ষায় থাকব কুতুব। প্রয়োজনে সারা জীবন তোমার ধ্যানে কাটিয়ে দেব, শুধু একটি অনুরোধ, আমাকে প্রতি মাসে জানাবে কি করছ, কোথায় আছ, কেমন আছ, কবে আসছ ? নতুবা আমাকে ফিরে এসে পাবে না কুতুব। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকে"।

নজমুল চৌধুরীর গল্পের ভাষা বিষয় উপযোগী, গতিময় এবং লক্ষ্যভেদী। যেমন, 'দারুচিনি দ্বীপ' গল্পের নায়ক আসিফ জেদ্দায় বেআইনীভাবে বসবাসের অপরাধে জেল খেটে দেশে ফিরছে। মাতৃভূমি আর প্রেমিকা ফরিদার সাথে মিলনের ব্যাকুলতার বর্ণনায় এ গল্পে লেখক যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। যেমন,

"ঠিক দু'বছরের মাথায় জেদ্দা হতে ঢাকাগামী বাংলাদেশ বিমানের ডিসি ১০-এ চড়ে বসেছে আসিফ। বে-আইনীভাবে বসবাসের অপরাধে একসপ্তাহ জেলবন্দী থেকে দেশে ফিরে যাওয়ার মধ্যে তার কোন অনুতাপ নেই। দেখতে দেখতে দু'বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। প্রবাসে এসেছিল বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য তার সফল হয়েছে। অনেক আগেই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নিজেকে গোছাতে গিয়ে সময়টা কিভাবে যে গড়িয়ে গেল তা সে টেরই পায়নি। আজ নিজেকে বড় হালকা মনে হচ্ছে মুক্ত স্বাধীন পাখির ন্যায়।

www.pathagar.com

যেন ত্বর সইছে না আসিফের। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। জীবনের শুরুতে যে আলো বাতাসে সে চোখ মেলেছিল, যে মাটির ঘাসফুলের সবুজ নরম গালিচায় তার দেহ-মন গড়াগড়ি খেয়ে বড় হয়েছে, সে মাটির আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাকুল আহবান তার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝড় তুলেছে। এ ঝড় মহামিলনের, আনন্দের, মহাসমারোহের।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্বেই বিমানটি তার বিশাল বপু নিয়ে আকাশে উড্ডয়ন করল। রোমাঞ্চিত হল আসিফের দেহমন এক অজানা পুলকে। জানালা পথে দৃষ্টি মেলে দেখে মুহূর্তে মর্তের মানুষ, চলন্ত যানবাহন, আর বিশাল বিশাল অট্টালিকাগুলো ক্ষুদ্র হতে হতে একসময় বিন্দুতে মিলিয়ে গেল। আকাশের নীল সামিয়ানায় সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে বিমানখানা ঠিক পূর্বদিকে আসিফের স্বপ্নরাজ্যে। জানালা দিয়ে বিস্তৃত মহাশূন্যে চোখ রাখে সে। থোকা থোকা তুলোর মত সাজানো মেঘের ভেলার তুলতুলে বিছানায় আসিফের দেহমন অজান্তে গড়াগড়ি খায়। কালো ও ধূসর মেঘের আবরণ ভেদ করে বিমানখানা এগিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে। পুঞ্জীভূত মেঘমালায় ভর করে মনও ওড়ে চলে নীল নীল নিঃসীমে। মনের অলিন্দে ভাসছে একটি মুখ। সে ফরিদার। জমে থাকা পাহাড়সম সাদাকালো মেঘের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে সে ফরিদার পেছনে, অথচ তার সাথে সে পেরে উঠছে না কোনমতেই। হাসতে হাসতে ফরিদা নাগালের বাইরে পালিয়ে যাচ্ছে। কখনো কালো মেঘের ফাঁকে ফঁকে তার দীঘল কালো চুলরাশিকে ইচ্ছা করেই ঢেকে রাখছে যাতে আসিফ খুঁজে না পায়। ক্লান্তিবিহীন এ লুকোচুরি খেলার অন্ত নেই। একসময় ফরিদা পেছন হতে কালো মেঘগুলোকে দু'হাতে ফাঁক করে পেছন হতে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে তাকে বলে, এবার ক্ষান্ত দাও সাহেব। সারাদিন চেষ্টা করলেও খুঁজে পাবে না। আমি যদি ধরা না দেই তাহলে আমাকে ধরার কি সাধ্য আছে তোমার ? হাসি পায় আসিফের। পাশের সিটের বাঙালি ভদ্রলোক বলে ওঠেন, কি সাহেব, বড় হাসছেন যে ? সম্বিত ফিরে পায় আসিফ। মুখ ঘুরিয়ে বলে- না, এমনিতেই..।"-দারুচিনি দ্বীপে

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ প্রকাশিত এ গল্পগ্রন্থটি আশা করি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

ঢাকা, জানুয়ারি, ২০০১

মুহম্মদ সিরাজ উদ্দীন
উপপরিচালক
বাংলা একাডেমী,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ সব সময় যত্নবান। বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক জনাব মুহম্মদ সিরাজ উদ্দীন-এর গবেষণাগ্রন্থ 'বাংলাদেশের লোক ধাঁধা', অধ্যাপক শাহেদ আলী-এর 'বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান', 'অতীত রাতের কাহিনী', 'শা'নযর', জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর 'নয়া জিন্দেগী' (১ম ও ২য় খন্ড), শফিউদ্দিন সর্দার-এর 'সূর্যাস্ত', চেমন আরা-এর 'হৃদয় নামের সরোবরে', মোস্তফা কামাল-এর 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস'(সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন), সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ-এর 'ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত', কাজী জাফরুল ইসলাম-এর 'মধ্যযুগের মুসলিম শাসকেরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি' এবং জনাব নজমুল চৌধুরী রচিত গল্প সংকলন 'দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন' এবং খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাসহ নবীন লেখকদের রচিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত ৯২টি সাহিত্যগ্রন্থ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

লেখক নজমুল চৌধুরী-এর অধিকাংশ গল্প মাতৃভূমি ও প্রবাস জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত। সৌদি আরব, বাংলাদেশ, ভারত ও বৃটেন-এর বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় গল্পগুলি ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয়েছে। গল্প বর্ণনায়, চরিত্র চিত্রনে, ভাষার ব্যবহার ও সংলাপ রচনায় লেখক যে সৃষ্টিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। সাহিত্যে ছোট গল্পের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাই আমরা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের জন্যে গ্রন্থটি মুদ্রিত করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। লেখকের মুদ্রিত কিন্তু অগ্রথিত অবশিষ্ট গল্পগুলো ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশ করার ইচ্ছে রইল। শত চেষ্টা সত্বেও কিছু মুদ্রণত্রুটি রয়েই গেল। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করবো ইনশাআল্লাহ।

মুনাওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা
অন্য গ্রহের ঠিকানায়	১
আঁধারের রূপ	১২
যবনিকার অন্তরালে	২১
দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন	৩২
দারুচিনি দ্বীপে	৪৫
প্রজাপতি মন	৫৪
মাদারীপীরের জটা	৬৩

www.pathagar.com

অন্য গ্রহের ঠিকানায়

অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত বিমানের টিকেট কনফার্ম করাতে পেরেছে কুতুব। মতিঝিল বিমান অফিস হতে বেরিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু কেনাকাটার কাজ গুলিস্তানের মোড় হতে সেরে নেয়। আগামীকাল ফ্লাইট সকাল এগারোটায়। সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে সময় থাকতে।

বিদেশ ভ্রমণ এই তার প্রথম নয়। দশবছর পূর্বে এমনি ওমরাহ ভিসা নিয়ে জেদ্দার পথে পাড়ি জমিয়েছিল সে। তখনকার সময়ই ছিল আলাদা। ওমরাহ ভিসা পেতে কোন সমস্যাই ছিল না, অথচ আজকাল ভিসা পেতে হলে দুর্ভোগের অন্ত নেই। ঢাকাস্থ সৌদি অ্যামব্যাসি কর্তৃপক্ষ ওমরাহ ভিসা দিতে নানারূপ টালবাহানা করে। নুরহানাকে সে কথা দিয়ে এসেছিল দু-তিন মাসের ভেতরই নতুন ভিসা নিয়ে এসে পড়বে, সেখানে দেখতে দেখতে একবছর গড়িয়ে গেল। চেষ্টার ত্রুটি করেনি সে । একা নূরহানারই নয়, অপেক্ষার কষ্ট তারও তো কম হয়নি।

বায়তুল মোকাররম হতে নুরহানার ফরমায়েস অনুযায়ী সুন্দর দুটো প্রিন্টের শাড়ি ও আনুষঙ্গিক জিনিষ কেনে রিক্সায় চেপে বসে কুতুব। রহমান চাচার খিলগাঁওয়ের বাসায় আছে সে। বাবার ফুফাতো ভাই সমবয়সী রহমান চাচা সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। গত বছর সৌদি হতে ফিরে তাঁর বাসায়ই উঠেছিল সে। বাসায় পৌছে কলিং বেলে টিপ দিতেই রহমান চাচা দরজা খুলতে খুলতে বলেন, এত দেরি কেনরে ? কিছু হল ? হাতের দিকে চেয়ে বলেন, কিছু একটা না হলে এত খরচই বা করবি কেন ? তোর নামে সৌদি হতে আজ একটি চিঠি এসেছে, খুব সম্ভবত গতটার মতই আরবিতে লেখা হবে। নে খুলে দেখ..।

ওয়াদী সোলাইজার পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্প দেখে কুতুবের বুঝতে কষ্ট হয় না এটা নুরহানার পত্র। ছমাস পূর্বে নুরহানার আরেকটি পত্র পেয়েছিল, কিন্তু উত্তর দেয়া হয়নি। উত্তর দিতে গেলেই তো সেই ট্র্যান্সলেশন অফিসের স্মরণাপন্ন হতে হবে, নিজের কথাগুলোকে আরবিতে সাজিয়ে লিখাতে হবে- এতসব ঝামেলার সময় কই তার ? কি বিপাকেই না পড়তে হয়েছিল নুরহানার গত চিঠি অনুবাদ করাতে গিয়ে। শেখ জামালুদ্দিন অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন রসিয়ে রসিয়ে। একগাল হাসি যোগ করে বলেছিলেন, এতো দেখছি লাইলী মজনুর কেচ্ছা কাহিনী !

এ ধরনের রসিকতা ভাল লাগেনি কুতুবের। অপরিচিত লোকের ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে রসিকতা ! কোন উত্তর দেয়নি কুতুব, শুধু একটি আফসোস নিয়ে ফিরে এসেছিল বাসায়। দীর্ঘ নয়টি বছর বাজী রেখে নুরহানাকে যেভাবে বাংলা শিখিয়ে এসেছে, তেমনি লিখতে শেখালে আজ এভাবে অপ্রস্তুত হতে হত না।

উপায় না দেখে আজও চৌধুরীপাড়ার সেই জামালুদ্দিন শেখের স্মরণাপন্ন হতে হচ্ছে। নিশ্চই নুরহানার কোন নুতন বায়না কিংবা কোন অসুখ বিসুখ ?

শেখ জামালুদ্দিন চিঠিখানা পড়ে উদাসভাবে তাকিয়ে রইলেন কুতুবের মুখ পানে। কথা জুটছে না মুখে। আস্তে আস্তে বললেন, সব শেষ ..।

কি বল্লেন ! সব শেষ মানে ?

নুরহানা নেই, নুরাইদা মৃত্যুশয্যায় .. না, না, এ হতে পারে না..। শেখ জামালুদ্দিন তাকে ভুল বলেছে.. হয়তো মসকরা করছে.. এ লোকটির চরিত্র কিছুটা এ ধরনের। আর কাউকে দিয়ে চিঠিখানা অনুবাদ করাতে হবে। কথা না বাড়িয়ে অনুবাদ খরচ পরিশোধ করে তড়িৎগতিতে রিক্সায় চেপে ঝিকাতলার অনুবাদ অফিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় সে।

অনুবাদকের হাতে পঞ্চাশ টাকা গুজে দিয়ে বলে, একটু তাড়াতাড়ি অনুবাদ করে দিন প্লিজ।

অনুবাদক চিঠির নিচের খালি অংশে বাংলায় অনুবাদ করে এগিয়ে দিয়ে বললেন,

www.pathagar.com

ব্যাপারটি দুঃখজনক বিধায় হুবহু অনুবাদ করে দিয়েছি, পড়ে নিন।

নুরহানার মা নুরাইদার লিখা .. স্বামী ও মেয়ের বিরহে আজ আমি মৃত্যুর প্রহর গুণছি। কোন্ দোষে আমার সোনার সংসার জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল কুতুব ? আমার একমাত্র মেয়ে তোমার প্রতীক্ষায় ধুঁকে ধুঁকে অকালে ঝরে গেল। জানি না তুমি বেঁচে আছ কিনা ? মেয়েরও একই প্রশ্ন ছিল, বেঁচে থাকলে কুতুব নীরব থাকতে পারতো না ? শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের প্রাক্কালে মেয়েটি তোমার কিছু আমানত রেখে যায়। তা তোমায় ফিরিয়ে দেব বলে হয়তো আমি এখনো বেঁচে আছি। হাতেগুণা কয়েকটি দিন হয়তো পাব; যদি আমার এ চিঠি পাও তাহলে সত্বর তোমার আমানত বুঝে নিতে এসো।

ঝাপসা হয়ে আসে চিঠির লাইনগুলো। মাথাটা ঘুরছে। স্কুটারে ওঠে খিলগাঁওয়ের দিকে রওয়ানা দেয় কুতুব। এক মিথ্যে কুহেলিকার মত মনে হচ্ছে শহরের জনপদ ও মানুষগুলোকে। জীবনের সব গতি যেন অচল হয়ে গেছে। অচল হয়ে গেল তারই ভুলের কারণে। একটা চিঠি লিখে নুরহানাকে তার অবস্থার কথা জানালে সে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যেত না। এ ভুলের মাশুল কিভাবে দেবে সে ? ভাবতে পারেনি এভাবে একটি প্রাণ তারই জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণে গুণে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। গত দশ বছরের স্মৃতির পর্দা তার চোখের সামনে উম্মোচিত হয়ে উপহাস করতে থাকে নিদারুণভাবে।

পিতৃসম্পত্তির শেষ একবিঘা জমি ও বাড়িটি বিক্রী করে ওমরাভিসা নিয়ে জেদ্দায় এসেছিল কুতুব। এয়ারপোর্ট কাউন্টার অতিক্রম করে বাইরের মুক্ত আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ নতুন জীবনের মুখোমুখি হল। চারদিকে অচেনা লোক, অজানা পরিবেশ। আরবি ভাষার সাথে পরিচয় বলতে কোরান শরীফ তিলাওয়াত, আর পড়াশুনা বলতে কলেজের প্রথম বর্ষ পর্যন্ত। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালেই তার জন্ম। অনেক তাবিজ কবজের বদৌলতে মাতৃগর্ভের সে প্রথম এবং শেষ সন্তান। বাবার ছিল কাপড়ের ব্যবসা। ভৈরব থেকে দোকানের মালামাল আনতে গিয়ে পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতার শিকার হন। রাস্তার পাশে লাশ তিনদিনে ফুলেফেঁপে ওঠার পর গ্রামের অন্য এক ব্যবসায়ী রুস্তম মিয়া শনাক্ত করে যখন মায়ের কাছে জানালো, মাও হার্টফেল করে বাবার অনুসারী হলেন। খালার কাছে বড় হয় কুতুব। খালার আর্থিক অসচ্ছলতাহেতু ওর পড়ার খরচ চলে পৈত্রিক সম্পত্তি বন্ধক রেখে। ছাত্র হিসেবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু সহপাঠি সবুজ এক চমকপ্রদ খবর দিয়ে মাথাটা দিল ঘুরিয়ে।

জানিস, আমাদের মটকা ফারুক সৌদিতে চলে গেছে। মদীনায় নাকি চাকরি করে। এইতো সেদিন তিনমাসের মাথায় বাপের কাছে ত্রিশ হাজার টাকা পাঠালো। পড়াশুনা করে কি হবে বল? ফরুক বুদ্ধিমান, তাই কেটে পড়েছে। বেকারত্বের বোঝা তাকে বয়ে বেড়াতে হবে না। পড়াশুনা শেষ করে কপালে আমাদের মাস্টারি জুটবে কিনা সন্দেহ।

ঠিকইতো। ফারুক এ বয়সেই উপার্জনক্ষম, আর কুতুব কিনা পৈত্রিক সম্পত্তি একে একে বন্ধক রেখে চলেছে। বাকি রয়েছে পাকা বাড়িটা। বি.এ পাশ করতেই শেষ হয়ে যাবে শেষ সম্বলটুকু। এরপর কি হবে ?

সাতপাঁচ ভাবনা কুতুবের মাথাটাকে ঘোলাটে করে দেয়। একসময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রাত দশটায় কদম আলী মেম্বারের বাড়িতে হাজির হয় কুতুব।

দরজায় টকটক আওয়াজ শুনে কদম আলীর স্ত্রী চেঁচিয়ে বলে, এত রাইতে কেডা ?

কদম আলী লেপের নিচে বউকে জড়িয়ে ধরে অতিরিক্ত উত্তাপ পাওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছিল। ফিস ফিস করে বলে, নিশ্চয়ই চেরাগ আলী। বলে দে, আমি বাড়ি নেই।

দরজায় পুনরায় শব্দ শুনে কদম আলীর বউ চেঁচিয়ে বলে, চেরাগ ভাই নাহি ?

চাচী আমি কুতুবগো। চাচার লগে জরুরি কথা আছে।

কুতুব ? কোন কুতুবগো ?

www.pathagar.com

আরে চাচী, এই গেরামে দুই নম্বর কুতুব আছে নাকি? আমি জসিমুদ্দিনের পোলা কুতুবুদ্দিন। এবার চিনছেন ?

কদম আলী আশ্বস্ত হয়ে বউকে বলে, ওহ, জসিমুদ্দিনের পোলা ? আচ্ছা দেহি, কি চায়?

গেঞ্জির ওপর একখানা চাদর জড়িয়ে এগিয়ে যায় কদম আলী দরজা লক্ষ্য করে। কুতুবের অভিপ্রায় শুনে মনের কোণে সযত্নে পুষে রাখা ইচ্ছেটাকে দমন করে বলে, খুব ভালা কথা ভাতিজা। কি করবা এদেশে থাইক্যা। দেশ কি আর আগের মত আছে ? লেহা পড়া জানা পোলাপানরা চাকরির জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে। তো, ভাতিজা, ট্যাহার কথা যে কইলা, এহন তো হাতে নাই। গেলো হপ্তায় জমিন কিনতে গিয়া .... ..।

চাচা ! আমার যে খুবই দরকার। যা পারেন দেন, বাড়ি রেজিস্টারি কইর‌্যা বন্ধক দিমু। এক বছরের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে না পারলে বাড়িটি আপনের অইয়া যাইবো। কথার নড়চড় অইবো না।

কুতুব ভাবে ফারুক যদি তিনমাসে ত্রিশহাজার টাকা পাঠাতে পারে তাহলে সে পারবে না কেন ? চিন্তামগ্ন কদম আলী আড়চোখে কুতুবকে পরখ করে। এ মোক্ষম সুযোগ সে হাতছাড়া করতে পারে না। গলায় দরদ ঢেলে বলে, ভাতিজা! তোমার বাপ আমার জানের দোস্ত আছিল একসময়। কেমনে তোমারে ফিরিয়া দেই..। দেহি সেলিম মাতবরের কাছ থাইক্যা ধার আনতে পারি কিনা..। কিন্তু বাজান, এক বছরের মধ্যেই ফেরত দেওন লাগব .. নইলে ভাতিজা ......।

বাড়ি আর জমি আপনের অইয়া যাইবো। কদম আলীর অসমাপ্ত বাক্যটি সমাপ্ত করে কুতুব।

বুঝতেই পারছ ভাতিজা, কর্জের টাহা সময়মত ফেরত না দিলে আমার মান থাকব না।

ঠিক আছে চাচা। কাইল দলিল নিয়া আমু- তয় একটা কথা চাচা, আমার খালায় যেন কথাটা না জানে।

কদম আলী কাঁচাপাকা দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে কুতুবের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। তার কত দিনের স্বপ্ন বড় রাস্তার মোড়ে বাড়ি থাকবে, বর্ষার কাঁদামাখা পা নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে না। এও জানে সে, বিদেশের পোকা যখন একবার কুতুবের মগজে ঢুকেছে তখন আর নামবে না অতি সহজে। তাহলে ধরে নিতে পারে জসিমুদ্দিনের পাকা বাড়িটা তার হয়ে গেল ! উপচে ওঠা খুশিতে একটা সস্তির নিঃশ্বাস নেয় কদম আলী।

জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণের মধ্য দিয়ে এক অচেনা আজানা জগতের সাথে পরিচয় ঘটে কুতুবের। কিন্তু এখন যাবে কোথায় সে ? মনে পড়ে যায় মটকা ফারুকের কথা। মদীনায় চাকরি করে। আসার সময় ওর ঠিকানাও নিয়ে এসেছে। এই অচেনা পরিবেশে ফারুককেই তার প্রথম দরকার। ফারুক হয়তো তার চাকরির একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে, কিন্তু কিভাবে মদীনায় যাবে সে? পাসপোর্ট বগলদাবা করে এয়াপোর্ট কাউন্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছিল কুতুব।

বয়স্ক একজন সৌদি লোক এসে শুধায়, তেবগা শুগুল ? ফি শুগুল ইন্দি !

কি জবাব দেবে কুতুব। হা করে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ লোকটির দিকে।

লোকটি ভাষাগত সমস্যা বুঝতে পেরে পাশে কর্মরত ইন্ডিয়ান ক্লিনারকে কাছে ডেকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেয়।

ক্লিনার কুতুবকে বলে, উয়ো আদমী বলরাহা, তোমহারা নকরী কা জরুরত হ্যায় তো উসকো পাস হ্যায়। হর মাহেনা সাতশ রিয়াল মিল যায়গা, আওর খানা পিনা বি ফ্রি। কেয়া খেয়াল হ্যায় তোমহারা ?

হে আল্লাহ ! তুমি এত মেহেরবান ! আসা মাত্রই চাকরি ! খাওয়া থাকা ফ্রি ! কদম

www.pathagar.com

আলী মেম্বর ছয়মাসের উপর বাড়িটি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে কি ? স্বগোতোক্তি করে কুতুব। এক সময় ক্লিনারকে বলে দেয়, উছকো বলো, নকরী মঞ্জুর হ্যায়। হিন্দি ছবি দেখে দেখে মোটামুটি ভালই কথাবার্তা রপ্ত করেছে সে।

একটানা চারঘন্টা মদীনার পথ অতিক্রম করে ওয়াদী খাবিরের ছোট্ট একটি বাজারে পৌঁছা মাত্রই লোকটির সাথে নেমে পড়ে কুতুব। ঈশারায় বসতে বলে লোকটি চোখের আড়াল হয়। ঘন্টাখানেক পর একটি উট, খাবার ও মশক ভর্তি পানি নিয়ে হাজির হয় লোকটি। কুতুবের দিকে মুচকি হেসে কলা ও রুটি এগিয়ে দেয় এবং পরক্ষণেই উটের পিঠে কোশন লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর কুতুবকে ধরে উটের পিঠে উঠায়, নিজেও উঠে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। উট এগিয়ে চলেছে অজানা গন্তব্যের পানে মরুভূমির পথ ধরে। কুতুবের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। পূব আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমলিয়ে ওঠে। তারই উজ্জ্বল আলোতে দৃষ্টিসীমানায় ধু ধু মরুভূমি, পাথুরে পাহাড়, আর দিগন্তবিস্তৃত বালিয়াড়ি নজরে পড়ে। সাগরের ঢেউয়ের মত মরুর বালুরাশি চিক চিক করছে। নিঝুম রাত। মধ্যে মধ্যে উটের পাল চোখে পড়ে। বীভৎস মুখ বানিয়ে দাঁত বের করে অতিকায় উটগুলো বোকার মত চেয়ে থাকে। গা ছমছম করে উঠে কুতুবের। যে লোকটি সামনে বসে আছে তারই বা সত্যিকারের পরিচয় কি ? এখন যদি তার বিপদের বন্ধু কয়েকটি ডলার ছিনিয়ে নিয়ে মরুর বুকে তাকে পুঁতে রাখে তাহলে মানুষ কেন, কাক পক্ষীটিও টের পাবে না। দুজন একসাথে চলছে, কিন্তু কারোর মুখে কোন কথা নেই। মধ্যে মধ্যে লোকটি রুটি ও খেজুর পিছনের দিকে ঠেলে দেয় নীরবে।

একটানা আড়াইঘন্টা পথ অতিক্রম করে লোকটি একসময় উট থামায়। নিজে নেমে কুতুবকে নামতে সাহায্য করে। ইশারায় তাকে বসতে বলে লোকটি এগিয়ে যায় কিছুদূর। এদিক সেদিক চেয়ে একসময় বসে পড়ে প্রকৃতির ডাকে। কুতুবও এ সুযোগ হাতছাড়া করে না। লোকটিকে অনুকরণ করে পানির প্রয়োজন বালি দিয়ে সারে।

ফিরে এসে লোকটি এই প্রথম মুখ খোলে, মুশ বায়িদ, কামান সোয়াইয়া..।

আন্দাজে কুতুব ধরে নেয়, লোকটি বুঝাতে চাচ্ছে, আর খুব একটা দূরে নয়। এইতো এসে পড়লাম।

উটের চলার গতি হিসাব করে আনুমানিক পঁচিশ মাইল পেরিয়ে এসেছে বলে কুতুবের মনে হয়। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় লোকটিকে আলীবাবার মতই লাগে। ছোটবেলায় আলীবাবার যে ছবি বইয়ে দেখেছিল- লোকটি যেন হুবহু সেই আলীবাবা। আকস্মিক ভাবে লোকটি এগিয়ে এসে কুতুবকে জড়িয়ে ধরে দুগালে চুমু খেতে খেতে বলে, লাত খউফ ইয়া ওয়ালাদি.।

কুতুব ভড়কে যায়। ভয়ে দুপা পিছিয়ে যায়। এহেন ব্যবহারের অর্থ কি ? কোন কু-মতলব আছে নাকি লোকটির মনে ? কাপড়ে ঘামের দুর্গন্ধে বমি আসার উপক্রম। পরনের কাপড় কোনদিন ধুয়েছে বলে মনে হয় না।

ঘন্টাখানেক চলার পর কুতুবের দৃষ্টি থেমে যায় অদূরের এক খেজুর বাগানে। পাতাগুলো ঝিরঝির করে দুলছে বাতাসের তালে তালে। মরুর বুকে এই প্রথমবারের মত সবুজের সমারোহ চোখে পড়ে তার। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলো আঁধারের লুকোচুরি। এত সুন্দর জ্যোৎস্না সে দেশে কখনো দেখেনি। মনে হচ্ছে চাঁদটা যেন নেমে এসেছে কয়েকশো মাইল নিচে। খানিকক্ষণ চলার পর একটা পাথুরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উট থামা মাত্রই কুতুবের ধ্যান কেটে যায়। সারি সারি ছোট বড় পাথুরে পাহাড়গুলো মিছিল করে করে সামনে অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

উট হতে নেমে লোকটি কুতুবকে নামতে সাহায্য করে। তাকে ইশারায় অনুসরণ করতে বলে লোকটি কোশন ও লাঠি হাতে এগিয়ে যায় পাহাড়ের উপত্যকা ঘেঁষে কিছুদূর।

www.pathagar.com

তারপর একসময় খেজুরপাতায় ঘেরা কবরের মত অপেক্ষাকৃত উচুঁ জায়গায় এসে দাঁড়ায়। কি যেন বলে হাতের লাঠি দিয়ে খোঁচাতে থাকে। ডং ডং শব্দ হয়। কুতুব বুঝতে পারে না লোকটির উদ্দেশ্য। তাহলে কি লোকটি পাতালপুরীর কোন দৈত্য-দানব ? লোভ দেখিয়ে, মানুষের রূপ ধরে মানুষকে ফাঁদে ফেলে উদর পূর্তি করে ? শেষ পর্যন্ত সেও এ ফাঁদে পা দিল ? পনরো বছরের তার এই নাদুস নুদুস দেহখানা আজ রাতে দৈত্যদানবের উৎসবে মুখরিত হবে ? কলিজাটা ভয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে, মাথাটা ঝিম ঝিম করছে অনাহুত বিপদের আশঙ্কায়। হঠাৎ এক নারীকণ্ঠ ভেসে এলো- না-য়া-ম, সবুর শোয়াইয়া..।

সবুর কথাটি বুঝতে অসুবিধা হয় না কুতুবের। পাতালপুরীর রাক্ষুসী তার স্বামীকে সবুরের মিনতি জানাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে খেজুরপাতায় ঘেরা কবরটি উপরের দিকে উঠে আসছে দেখে বাঁচাও বলে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ে কুতুব মাটিতে।

জ্ঞান ফিরতেই কুতুব দেখে পাশে বসে আছে আনুমানিক দশ বছরের সুশ্রী এক বালিকা ও কালো চাদরে আবৃতা এক মহিলা।

নুরহানা- হাত কাছা হালিব। নির্দেশ পেয়ে বালিকাটি একবাটি দুধ এনে দেয় মায়ের হাতে। জলপট্টি মাথা থেকে সরিয়ে মহিলা দুধের বাটি এগিয়ে নেন কুতুবের মুখের সামনে- খোদ হালিব, আশরব শোয়াইয়া... ইনশাআল্লাহ বাদইন্ ছাহাহ্ কয়েস....।

কুতুব বুঝতে পারে, একবাটি দুধ পান করে শরীরে একটু শক্তি অর্জন করার জন্য মহিলাটি অনুরোধ করছে। মাথাটা একটু উঠিয়ে এক চুমুকে শেষ করে বিনা বাক্যব্যয়ে। মহিলা কপালে হাত দিয়ে জ্বরের মাত্রা পরীক্ষা করে- 'খাল্লিক নউম' বলে তাকে আবার শুইয়ে দেন।

কুতুব বুঝতে পারে তার শরীরে জ্বরের মাত্রা একটু বেশি। কিন্তু জ্বর কেন, আর কেমন করে সে এখানে এল ? পাশে বসে আপনজনদের মত যারা তার সেবা করছে তারাই বা কারা ?

আস্তে আস্তে মনে পড়ে গত রাতের কথা। কবর উঠে আসছে দেখে চিৎকার করেছিল। আর কিছু মনে নেই। তাহলে এই মহিলাটিকেই সে পাতালপুরীর রাক্ষুসী মনে করেছিল। লজ্জিত মুখ চাদর দিয়ে ঢাকে।

লোকটি ঘরে ঢুকে বলে, ক্যাফ আল্ ওয়ালাদ নুরাইদা ?

মহিলা পুনরায় বাটিতে দুধ ঢালতে ঢালতে বলে, তাইয়্যিব আবু আম্মারা, তাইয়্যিব। ব্যাস- সোয়াইয়া তাবান। জ্বরের ঘোরেও বুঝতে পারে কুতুব তার শারীরিক অবস্থার খবর নিতে এসেছিল।

তিনচারদিনের মাথায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে কুতুব। নুরাইদা জিজ্ঞেস করে, এস ইসমাক ইয়া ওয়ালাদি ? কুতুব ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে পুনরায় মহিলাটি মেয়ের দিকে ইশারা করে বলে, হাজা বিন্‌তি, ইসমাহা নুরহানা। নিজের বুকে হাত রেখে বলে, ওয়া আনা ইসমী নুরাইদা। তারপর কুতুবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে বলে, এস্ ইসমাক ? এবার সে নিজের বুকে হাত দিয়ে বলে ওঠে, কুতুব ...।

কুতুব ! ওয়াল্লাহি হেলু জেদ্দান..। কুতুব বুঝতে পারে তার নাম নিয়ে প্রশংসা করা হচ্ছে। হবে না ? কুতুব পীর আউলিয়াদের বলা হয়।

আনা এব্‌গা এলাব। নুরহানা বায়না ধরে মায়ের কাছে। কুতুবের আঙ্গুল ধরে টানতে থাকে বাইর পানে।

তাইয়্যিব, খোদ মায়া-কি কুতুব, কয়েস ?

মায়ের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে এবার নুরহানা উচ্ছ্বসিত হয়ে কুতুবের হাত ধরে টানতে থাকে বাইরের দিকে।

এঘর থেকে ওঘর ঘুরে ঘুরে দেখে কুতুব নুরহানার হাত ধরে। চারদিন পর বিছানা ছেড়েছে। নরম খড়ের উপর ভারি ত্রিপল আর পশুর চামড়ার তৈরি বালিশের খোলের

www.pathagar.com

ভেতর নরম শুকনো তৃণলতা। মাটির নিচে গর্ত করা প্রশস্ত তিনটি রুমে খেজুর পাতার পার্টিশন। খেজুর গাছের তক্তার উপর খেজুর পাতার ছাউনী দিয়ে তৈরি ঘরের ছাদ। ছাদের একপাশে গোল করে কাটা কাঠের তৈরি নেট দিয়ে ঘেরাও দিয়ে ভেন্টিলেশনের এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। ছোট্ট একটি পাকঘর। ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছাদ হতে খেজুর গাছের কাণ্ড দিয়ে তৈরি জাহাজের চিমনির মত কয়েক হাত উপরে উঠে গেছে। ঘরের এককোণে বড় এক পিঞ্জিরায় এক বাজ পাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে। ব্লেডের মত ধারালো তার নখ ও ঠোঁট। কুতুবকে দেখে রক্তিম চোখ দুটো মেলে যেন হিংস্র হয়ে উঠে। প্রতিবাদ জানায় আজানা আগন্তুকের। পিঞ্জিরামুক্ত হলে এতক্ষণে হয়তো কুতুবের দুচোখ উপড়ে নিত।

নুরহানা কুতুবকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার জন্য টানতে থাকে। ছাদের সাথে যুক্ত তিন হাত লম্বা ও দুহাত চওড়া একটি টিনের দরজা। লাঠি দিয়ে ঠেলে উপরে উঠতে হয়। তাহলে এই দরজার উপরেই আবু আম্মারা সেদিন লাঠি দিয়ে খোঁচা দিচ্ছিল ! আকস্মিক কবরের মতো উঁচু জায়গাটি উপরের দিকে উঠে আসতে দেখে কুতুব মূর্ছা গিয়েছিল। হাসি পায় কুতুবের। নুরহানার সাথে সিঁড়ি বেয়ে টিনের দরজা ঠেলে উপরে উঠে আসে কুতুব। খোলা আকাশের নিচে রোদের প্রখরতায় বিস্তৃত মরুর বালি চিক চিক করছে। উপর থেকে বুঝার সাধ্য নেই যে নিচে মনুষ্যবসতি আছে। নিশ্চয় এই পাহাড়ের উপত্যকা জুড়ে রয়েছে এরকম আরো অনেক বেদুঈন পরিবার। প্রচণ্ড গরম এড়ানোর জন্যই হয়তো মাটির নিচে বাসস্থানের ব্যবস্থা। ঘরে না আছে ফ্রিজ, টিভি, এয়ারকুলার কিংবা অন্যান্য বিলাসসামগ্রী। সভ্য জগতের কোন নিদর্শন নেই। যবের তৈরি রুটি, পাকা খেজুর, মশলাবিহীন পোড়া মাংস আর দুধই হচ্ছে তাদের নিত্যদিনের খাদ্য।

নুরহানা ওকে নিয়ে চলে খেজুর বাগানে। যেতে যেতে কথা বলছে অনর্গল। কুতুব দুকান ভরে তাজ্জব হয়ে শুনে। আকারে ইঙ্গিতে কিছু কিছু বুঝে। উত্তর দেয় বাংলায়। নুরহানা কুতুবের মুখের পানে হা করে চেয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে কুতুবের বাংলাকে। যে বয়সে খুব সহজে ভাষা রপ্ত করা যায় সে বয়সই নুরহানার। তাই কুতুবের বাংলাকে রপ্ত করতে খুব বেশিদিন লাগেনি তার। দ্বিগুণ উৎসাহে কুতুব ওকে বাংলা শেখায় মাস্টারি কায়দায়। এমনকি তুই, তুমি ও আপনির ব্যবধানও শেখাতে ভুলে না। মধ্যে মধ্যে নুরহানা আরবিতে পিতামাতাকে কুতুবের বাংলার মানে বুঝিয়ে দেয় দুভাষীর মত।

দুজনে একসাথে দিনের আলোয় মরুপ্রান্তরে ছাগল আর উট চড়ায়। খেজুর বাগানের কূপা হতে গাছের নিচে পানি ঢালে দুজন মিলে। একজন অন্যজনের গায়ে পানি ছিটিয়ে হেসে লুটোপুটি খায়। কুতুবের মনেই থাকে না দেশের কথা, কদম আলী মেম্বারের কথা।

অনেকদিন পর একদিন খেজুর গাছে পানি দিতে গিয়ে নুরহানার পায়ে তাজা রক্ত দেখে কুতুব ভড়কে যায়। নুরহানা নিজেও বুঝতে পারে না কিসে তাকে কামড় দিল। ওকে টেনে টেনে কুতুব নিয়ে যায় নুরাইদার কাছে, বলে উম্মি ওকে বিচ্ছু জাতীয় কিছু একটা কামড় দিয়েছে। নুরাইদাকে নুরহানার মত সে উম্মিই ডাকে। নুরাইদা মেয়ের মুখে কোন ভাবান্তর খুঁজে না পেয়ে কুতুবের দিকে ফিরে বলে, ঠিক আছে তুমি কাজে যাও, আমি দেখছি। নুরাইদা নুরহানাকে টেনে নিয়ে যায় ঘর অভ্যন্তরে।

এরপর থেকে নুরহানার এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে কুতুব। বোরখা পরা নুরহানার মাঝে যেন আগের সেই চপলতা নেই। কথাবার্তায়, চলাফেরায় নুরহানা এক দেয়াল সৃষ্টি করে রাখে কুতুব ও তার মাঝে।

কুতুব বুঝতে পারে না মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে নুরহানার এ পরিবর্তনের কারণ? অভিমানে নিজেকেও সে গুটিয়ে নেয়। একসাথে উট চড়াতে গেলেও সে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে নুরহানাকে। মাপাঝোকা কথার মধ্য দিয়েই দুজনার দিনের কাজ সমাপ্ত হয়।

মরুর হাওয়ার উপর ভর করে সময়ও এগিয়ে চলে দাম্ভিক গতিতে। বছরের পর

www.pathagar.com

মরুর হাওয়ার উপর ভর করে সময়ও এগিয়ে চলে দাম্ভিক গতিতে। বছরের পর বছর কেটে যায়। বেদুঈন পরিবারের ভালমন্দের সাথে যোগ হয় কুতুবের চাওয়া পাওয়া। মরুর লু হাওয়া কুতুব-নুরহানার কানে কানে ভাললাগার মন্ত্র শিখিয়ে যায় এক সময়, কিন্তু প্রকাশের ভাষা কারোর জানা নেই।

ছাগল চরাতে গেলে নুরহানা একদিন কুতুবকে বলে- কবে তুমি দেশে যাবে কুতুব ? বিয়ে করবে না ?

বাংলা যেমন করে কিছুটা শিখেছিস তেমনি ইংরেজিটাও কিছুটা শিখে নে, তারপর দেখা যাবে।

কেন, আমাকে ইংরেজি শিখিয়ে তোমার বউয়ের মাস্টার বানাবে নাকি ?

আমার বউয়ের মাস্টারি তোকে করতে হবে না, তোর স্বামীকে শিখাবি। স্বামীকে নিয়ে যখন দেশ-বিদেশে ঘুরবি, বড় বড় শহরে বেড়াতে যাবি তখন ইংরেজিটা কাজে লাগবে, বুঝলি ?

বড় বড় শহরে কি দেখার আছে বলতো ? কয়েকটি দালানকোঠা আর গাড়ি ঘোড়া- এইতো ? জানো, ছোট্ট বেলায় আবুইয়ার সাথে একবার জেদ্দা শহরে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভালো লাগেনি। আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলাম দুদিন। মানুষগুলোর যেন প্রাণ নেই। শুধুই ব্যস্ততা। ওরা ঠাণ্ডা বাক্স হতে পানি খায়। বদ্ধঘরে একটি বাক্স হতে বেরিয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস ওরা সেবন করে। আমারতো দম বন্ধ হয়ে আসছিল- এটি একটি জীবন হলো বলতে পারো ? দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াবার দরকার নেই, তবে খুব ইচ্ছে হয় তোমার দেশটা ঘুরে আসি। আচ্ছা বলতো তোমাদের দেশের মেয়েরা কি ধরনের কাপড় পরতে ভালবাসে ?

রং বেরঙের শাড়ি আর হাতে কাচের চুড়ি। এর মধ্যে কি যে সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এর তুই কি বুঝবি ?

তাহলে আমাকে দুটো শাড়ি আর চুড়ি আনিয়ে দাও না কাউকে দিয়ে। তোমার যখন শাড়িই পছন্দ তখন না হয় একবার পরে দেখাবো ..... নুরহানা বায়না ধরে।

আমার পছন্দের সাথে তোর কি সম্পর্ক? সুন্দর লাগলেই কি আর না লাগলেই বা কি?

আমাকে সুন্দর লাগুক এটা তুমি চাওনা ?

তার মানে ?

ছাগল ভেড়া চরিয়ে দেখছি ভেড়াই বনে গেছ। এতদিন তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছ- এখন হতে আমি তোমাকে শেখাবো।

কি- তুই আমাকে শিখাবি?

নয়তো কি? দেখনা আমাদের নাদিয়ার পিছনে ফাহিম কিভাবে ঘুরে বেড়ায়। কই, ফাহিমতো নাদিয়াকে কখনো এড়িয়ে চলে না বরং নাদিয়াকে পাশে রেখে চলতে তার কত আনন্দ, অথচ...... ।

ফাহিম আর নাদিয়া ভেড়া ভেড়ি। ফাহিম বুঝে না বলে নাদিয়ার পিছনে ঘুরে বেড়ায় .... কিন্তু আমাকে ওদের সাথে তুলনা করছিস কেন?

ফাহিম ঠিকই বুঝে তাইতো নাদিয়ার এত আনন্দ, আর তুমি বুঝনা বলে আমার এত দুঃখ.. বাঁকা চোখে কুতুবের পানে চেয়ে নুরহানা কেটে পড়ে মায়ের উদ্দেশ্যে।

কুতুবের পঁচিশ বছরের উত্তপ্ত যৌবন আকস্মিক এক ঝাটকা দিয়ে টগবগিয়ে উঠে। ধূসর মরুর দমকা হাওয়া তার হৃদয়ের কোষে কোষে এই প্রথমবারের মত প্রেমের মুকুল ছড়াতে থাকে। সত্যিই সে বোকা, নতুবা নুরহানার মনের কথা বুঝতে তার এত দেরি হল কেন? ঘুমন্ত এক পৌরুষ যেন কথার কষাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে তীব্র এক দহনে জ্বলতে জ্বলতে খুঁজতে থাকে প্রেয়সীর আশ্রয়।

নিজের পিতা-মাতাকে মনে নেই কুতুবের। স্নেহ বঞ্চিত কুতুব তাই বোধ হয় সহজেই

www.pathagar.com

আবু আম্মারা ও নুরাইদাকে পিতামাতার আসনে বসিয়ে এতিম হওয়ার কষ্ট ভুলতে পেরেছিল। এদিকে নুরাইদা ও আবু আম্মারা কুতুবকে পেয়ে যেন ভুলতে পেরেছিল পেটের ছেলে আম্মারার অকাল মৃত্যুর শোক।

আবু আম্মারা নিজ হাতে কুতুবকে শিখিয়েছে, বাজপাখি দিয়ে কিভাবে মরুর খরগোশ আর ঘুঘু শিকার করতে হয়। কটিবন্ধে উন্মোক্ত তরবারি নিয়ে বেদুঈনদের আচার অনুষ্ঠানে কিভাবে নাচতে হয়।

ওয়াদী সোলইজা হতে পনরো মাইলের রাস্তা অতিক্রম করে লোহিত সাগর পাড়ের মাঝি মাল্লাদের কাছ হতে তাজা মাছ কিনে আনার জন্য কুতুবকে নিয়ে আবু আম্মারা প্রায়ই যেত। মাছের প্রতি কুতুবের দুর্বলতার কথা এ পরিবারের সবার জানাজানি হয়ে গেছে। একদিন মাছ নিয়ে ফেরার পথে আবু আম্মারা কুতুবকে প্রশ্ন করে- ওয়ালাদি, তেবগা জাওয়াজ বিনতি নুরহানা ?

বাপের মুখে সরাসরি তার কাছে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব ! উটের পিঠে বসে থাকা আবু আম্মারার কথার জবাব খুঁজে না পেয়ে হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা যেন ঝরে পড়ে অঝর ধারায়। নীরবে আবু আম্মারার পিঠে মুখ ঘষতে থাকে কুতুব। যেন পিতার কাছে পুত্রের স্বীকৃতির নীরব বহিঃপ্রকাশ। কান্নার নোনাজলে সিক্ত হয়ে পিছন ফিরে আবু আম্মারা কুতুবের গালে নীরবে চুমু খায়। নিজের ছেলে আম্মারা বেঁচে থাকলে হয়তো কুতুবের সমবয়সী হত।

সাগর হতে নিয়ে আসা মাছগুলো পুড়ছিল কুতুব নুরহানা মিলে। মাছ দেখলে লোভ সামলাতে পারে না কুতুব। নিজেই লেগে যায় মজা করে খাওয়ার আয়োজনে। নুরহানার দিকে চেয়ে বলে- ভারি সুন্দর লাগছে আজ তোকে !

তাই নাকি ? তোমার চোখ আছে জানতাম নাতো ?

জানিস, আবুইয়া আজ আমাকে কি বললেন ?

কি ?

না, বলব না।

শুনতে আমার বয়েই গেছে।

না শুনলে না শুনবি, বিন নসীবের বোনতো শুনবে যেহেতু আবুইয়ার ইচ্ছা ওর সাথে আমার বিয়ে হোক।

তাই নাকি ? খুব ভাল কথা। ওর একটা ট্যারা চোখ আছে, তোমাকে খুব ভাল করে দেখবে। হাসি সংবরণ করতে না পেরে খিলখিলিয়ে হেসে উঠে নুরহানা।

ট্যারা হয়েছেতো কি হয়েছে ? ওর যা গলা !

ঠিক আছে, ওর গলা ধরে নাচগে যাও। নাচতে তো তুমি ভালই পারো...! কৃত্রিম অভিমানে নুরহানা অন্যদিকে মুখ ফেরায়। উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ে। বলে- আর তোমার হয়তো জানা নেই আবুইয়া বিন্ নসীবের সাথে আমার বিয়ে দিতে চান।

তুই চাস না ?

চইলে চাইতেও পারি। সেটা তোমার জেনে লাভ কি ?

তবে দেরি করছিস্ কেন- এখনই ওর বাড়িতে গিয়ে গলায় মালা পরিয়ে দে.....।

তারই গলায় পরাবো যার নামের প্রথম অক্ষর শুরু হয়েছে কু দিয়ে.....।

আর আবুইয়া আমার বিয়ে যার সাথে দিতে চান তার নাম শুরু হয়েছে নু দিয়ে...।

উত্তর প্রতিউত্তরের প্রতিযোগিতা শেষে দুজনেই হেসে উঠে খিলখিলিয়ে। পোড়া মাছের গন্ধ বাতাসে মৌ মৌ। নুরহানা একটি ছোট্ট পোড়া মাছ তুলে দেয় কুতুবের মুখে, কুতুব সে মাছটি পরম গোগ্রাসে মুখে পুরে নিতে গিয়ে নুরহানার একটি আঙ্গুল চেপে ধরে দাঁতের ফাঁকে।

নুরহানা আঙ্গুল ছাড়াতে গেলে কুতুব বলে- বিন্ নসীবের বোনের ট্যারা চোখের কথা বলে আর কোনদিন খোঁটা দিবি ?

www.pathagar.com

বলবনা কেন ? সেদিন ছাগল চরাতে গিয়ে বিন্ নসীবের বোনের দিকে ওমন করে তাকাচ্ছিলে কেন ? কৃত্রিম অভিমানে নুরহানা মুখ ফেরায়।

কেন জানিস ? সামান্য একটি খুঁত মানুষকে কিভাবে অসুন্দর বানিয়ে দিতে পারে সে জিনিসটি লক্ষ্য করছিলাম। একটু থেমে বলে- দুনিয়ার সব মেয়েদের বোধহয় এই একই দোষ। যাকে ভালবাসে তার সবকিছুতে তার একচেটিয়া অধিকার....। ঠিক আছে..... আর তাকাবো না, কথা দিলাম- হলতো?

চুলের মুঠো ধরে নুরহানার মুখখানা উঠাতে গিয়ে কুতুব এই প্রথমবারের মত অনুভব করে শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক উদ্দাম শিহরণ। কথা যেন জোর করে কে আটকে দিয়েছে গলার নিচে। নয় বছর আগের সেই চপলা বালিকা খেলার সাথী নুরহানাকে আজ নুতন করে আবিষ্কার করে কুতুব। নীরবে চুলে বিলি কাটতে কাটতে হৃদয়ের ধমনীতে অনুভব করে এক উষ্ণ মদিরতা। নুরহানা আবেশে তা ভোগ করে নীরবে। আনন্দের ফাল্গুধারা একসময় চোখ ভাসিয়ে বৃষ্টির ফোঁটার মতই টপ টপ করে পড়তে থাকে। যৌবনের শুরুতে এক ভিনদেশীর ভাষা শিখেছে সে তোতা পাখির মতো। কে বলবে আজ সে মরুচারী এক বেদুঈন কন্যা ? তার ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন ধাঁচে গড়া। এক ভিনদেশী শিক্ষকের মমতা মিশানো দুরূহ ভাষা সে রপ্ত করতে পেরেছে সমস্ত মেধা ও মনন মিশিয়ে অতি অল্প সময়ে। কিন্তু কিসে কি হয়ে গেল ! আকস্মিক এক ঝড়ো হাওয়া এসে কুতুব নুরহানার স্বপ্নের নীড় ভেঙ্গে তছনছ করে দিল।

হজ্জের মওসুমে খেজুর বিক্রির হিড়িক পড়ে যায় ওয়াদী সোলাইজার বেদুঈন পল্লীতে। আবু আম্মারা দুটো খেজুর বাগানের মালিক। হজ্জের মওসুমে মদীনা মনোয়ারায় খেজুর চালান দিয়ে কড়কড়ে রিয়াল গণে প্রতি বছর।

খেজুর পাড়ছিল কুতুব। নিচে আবু আম্মারা কাঁধি কাঁধি পাকা খেজুর জড়ো করছিল। নুরহানা নুরাইদা দুরে মেষ চরাচ্ছিল। আবু আম্মারার আকস্মিক হৃদয় বিদারক চিৎকার শুনে কুতুব খেজুরগাছ হতে নিচে নেমে দেখে তার বুক ভেদ করে আটকে আছে একটি তীরের ফলা। তীর খুলে প্লাবিত রক্তের ধারা বন্ধ করার প্রয়াসে নিজের জামা চেপে ধরে কুতুব ক্ষতস্থানে। চিৎকার করে সাহায্যের আবেদন জানায় সে। চিৎকার শুনে বেদুঈন পল্লীর অনেকেই ছুটে আসে। বিন্ নসীবও সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে ছুটে আসে। বাকরুদ্ধ কুতুবের শার্টের কলার ধরে হেঁচকা টানে কাছে নিয়ে প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দেয় চোয়ালে। আরবিতে বলে উঠে- কুত্তা, ভেবেছিস বুড়োটাকে মেরে মাটিতে পুতে সম্পত্তি দখল করে নিবি, তাই না ?

দুহাতে ও জামায় রক্তমাখানো বাকহারা কুতুবকে ধরে বিন্ নসীবের দল থানার পথে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। পথিমধ্যে নুরহানা নুরাইদার সাথে দেখা হলে বিন নসীব বলে, দ্রুত তোমাদের খেজুর বাগানে যাও। ওখানে গেলেই ঘটনা জানতে পারবে। আমি পশুটাকে থানায় দিয়ে আসি। কুতুবকে বলার অবকাশ না দিয়েই টেনে নিয়ে চলে ওরা।

ঘন ঘন জ্ঞান হারানোর বিপর্যয় কাটিয়ে পনরো দিনের মাথায় সুস্থ হয়ে উঠে নুরহানা। বিন নসীবের মুখে পিতার মর্মান্তিক খুনের কাহিনী শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায় সে। পরম আত্মীয়ের মত বিন নসীব ওদের পাশে দাঁড়ায়। নুরাইদাকে বলে- দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছিলে চাচী। বেটা আজনবী ভেবেছিল চাচাকে মেরে সব টাকা পয়সা লুটে দেশে পালাবে। আমি যদি সাথে সাথে এসে না পড়তাম তাহলে কি যে হত তা আল্লাহ-ই জানেন। পথের কাঁটা সরাতে গিয়ে নিশ্চয়ই সে তোমাদেরকেও খুন করত। একটা খুনিকে কিভাবে তোমরা পরিবারের একজন বানিয়ে পুষে আসছ এতদিন ধরে তা ভেবে আশ্চর্য হই !

ঘৃণায় নুরহানা চোখ বুজে। এমন একটা মানুষকে সে হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান দিয়েছিল ! টাকাই যদি চেয়েছিল তাহলে বল্লেই পারত। আবুইয়া যাকে এত ভালবেসেছিলেন তার কাছেই তাকে খুন হতে হল- ছি, ছি, ছি.....!

www.pathagar.com

আবু আম্মার মৃত্যুর পর বিন্ নসীব নুরাইদা পরিবারের ভালমন্দ দেখাশুনার ভার নিয়েছে। সময়ে অসময়ে নুরহানার কাছে এসে খাতির জমাতে চেষ্টা করে। মাসখানেক পর আকস্মিক ভাবে একদিন পুলিশের লোকজন এসে বিন্ নসীব ও তার দুজন বন্ধুকে সন্দেহক্রমে ধরে নিয়ে যাওয়াতে নুরহানার মনে বিন্ নসীবের প্রতি সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে। দীর্ঘ নয় বছর কুতুবকে আবুইয়ার কাছে তার মাসোয়ারা চাইতে দেখেনি। নুরহানাকে বলত মাসিক বেতন নিয়ে আবুইয়ার স্নেহকে সে খাটো করতে পারবে না। আবুইয়া জোর করলে বলতো- যখন দরকার পড়বে তখন চেয়ে নেবে। সেই কুতুব কেমন করে আবুইয়াকে সম্পত্তির লোভে খুন করতে পারে ? থানার পদস্থ অফিসার মা মেয়ের জবানবন্দী নিতে এলে নুরহানা সেই সাক্ষ্য দিল। বিন নসীবকেই বা সন্দেহ করে কিভাবে ? কুতুব আবুইয়ার সাথে খেজুর বাগানে ছিল- বিন নসীব চিৎকার শুনে পাড়াপড়শি নিয়ে ছুটে আসে। তাহলে কে এমন নির্মমভাবে তার পিতাকে হত্যা করতে পারল ?

প্রায় ছ-মাস পর ওয়াদী সোলাইজার বেদুঈন পল্লীতে সরকারি পক্ষ হতে ঢোল পেটা হল। শুক্রবার জুমার নামাজান্তে আবুআম্মারার খুনের রায় ঘোষিত হবে। কাজীর রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুনিকে প্রকাশ্যে কতল করা হবে। কাজীর হুকুম- নুরহানা ও নুরাইদাকে অবশ্যই যেতে হবে স্বচক্ষে বিচার দেখতে।

শুক্রবার জুমার নামাজান্তে ওয়াদী সুলাইজার বেদুঈন পল্লীর আবাল বৃদ্ধ বণিতা দীর্ঘ তিন মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছে থানার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সুষ্ঠু বিচার দেখতে। থানা প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। সবার মুখে একই কথা- আবু আম্মারা দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছে, ফল যা হবার তাই হয়েছে।

নুরাইদা ও নুরহানার সামনে কাজী মাইকে পুলিশ রিপোর্ট ও সাক্ষ্য সাবুদ অনুযায়ী বিচারের রায় ঘোষণা করলেন। কুতুব ও বিন্ নসীবকে গোল চত্বরে নিয়ে আসা হল। বিন্ নসীবের চোখ বাঁধা। কাজীর রায় শুনে সবাই হতভম্ভ হয়ে গেল। বিচারের রায়ের সারাংশ জানানো হল- নুরহানাকে পাবার লোভে বিন্ নসীব এ জঘন্য পথ বেছে নিয়েছিল। দশ বছর বে-আইনীভাবে থাকার অপরাধে একমাসের জেল শেষে কুতুবকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে- এ রায়টিও জানিয়ে দেয়া হল।

প্রচুর করতালির মাধ্যমে জল্লাদ তার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করল। নুরহানা কুতুবের দিকে সজল চোখে এগিয়ে এসে বলে- তোমাকে আমার এ মুহূর্ত বড়ই দরকার কুতুব। তুমি চলে গেলে কি নিয়ে বেঁচে থাকব বল?

শক্ত হও নুরহানা। পিতৃসম আবুইয়ার স্নেহের ঋণ কিভাবে আমি শোধ করবো বল ? জীবনে পিতাকে দেখি নি- সে অভাব আমার পূরণ হয়েছিল, কিন্তু কিসে কি হয়ে গেল! ভাগ্যটা আমার এত খারাপ কেন বলতে পারিস ? ডুকরে কেঁদে উঠে কুতুব। কান্নাজড়িত কণ্ঠে নুরহানাকে বলে, চিন্তা করিস না, আমি আবার ফিরে আসব নতুন ভিসা নিয়ে। তোকে আর হারাতে চাই না- আবুইয়ার ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখব না। জীবন দিয়ে তা রক্ষা করব। কয়েকটা দিন সবুর কর নুরহানা, হাতে গুণা কয়েকটা দিন মাত্র, কি পারবি না?

আমি সে অপেক্ষায় থাকব কুতুব। প্রয়োজনে সারা জীবন তোমার ধ্যানে কাটিয়ে দেব, শুধু একটি অনুরোধ, আমাকে প্রতি মাসে জানাবে কি করছ, কোথায় আছ, কেমন আছ, কবে আসছ ? নতুবা আমাকে ফিরে এসে পাবে না কুতুব। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকে নুরহানা। নুরাইদা চোখের জল সামলাতে ব্যস্ত। কুতুব- নুরহানার কথার তাৎপর্য খুঁজতে থাকে নীরবে।

নুরহানা বোরখার ভেতর হতে কাপড়ের একটি বাণ্ডিল বের করে কুতুবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, আবুইয়া তোমার জন্য এটা রেখে গেছেন।

এটা কি?

www.pathagar.com

আশা পূরণের জন্য বাড়তিগুলো কোন এতিমখানায় খয়রাত করে দেবে।

কুতুবের চোখের জল বাধ মানে না। অবিরল ধারায় তা টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছে। একটা কাগজে রহমান চাচার ঠিকানা লিখে দিয়ে বলে- কাউকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে খবর জানাতে ভুলিস না কিন্তু।

নুরহানাকে তিন মাসের সময় দিয়ে একমাস জেল খেটে কুতুব ফিরে এসেছিল দেশে। সেই অবধি রহমান চাচার বাসায় থেকে ভিসার জন্য ধর্ণা দিয়ে আসছিল। সে ভিসা যোগাড় করতে গিয়ে তিনমাসের স্থলে এক বছর পার হয়ে গেল। ভিসা যোগাড় হল বটে কিন্তু নুরহানা এভাবে তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল ! স্কুটারের ভাড়া মিটিয়ে টলতে টলতে বাসায় ফিরে কুতুব।

কি-রে কি হয়েছে ? শরীর খারাপ নাকি ? কুতুবের দিকে প্রশ্ন রাখেন রহমান চাচা।

আমাকে একটু একা থাকতে দাও চাচা। বড্ড মাথা ধরেছে। পরে কথা হবে। নিজের রুমে ঢুকে দরজায় খিল দেয় কুতুব।

কালতো চলেই যাবি। তুই যাবার পর কিন্তু আমার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, নইলে.......।

প্লিজ চাচা, দোহাই তোমার, পরে কথা হবে, দরজার ওপাশ হতে কুতুব উত্তর দেয়।

রাত গভীর হয়। চাচা অনেক চেষ্টা করেও কুতুবকে কিছু খাওয়াতে পারেনি। একই উত্তর ক্ষিধা নেই।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। আবারো হয়তো বৃষ্টি নামবে অঝর ধারায়। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সুপ্তির ক্রোড়ে ঢলে পড়ে নিদ্রাতুর পৃথিবী। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে কুতুব, কি চেয়েছিলে তুমি, আর কি পেয়েছ ? ভাগ্যের লিখন খণ্ডাতে পেরেছ ?

উহঃ আর পারছে, না কুতুব। একসময় চিঠির প্যাড টেনে খস্ খস্ করে লিখতে শুরু করে.......

চাচা! জন্ম হতে ভাগ্যবিড়ম্বিত এক এতিম অবশেষে বেঁচে থাকার এক অবলম্বন খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু নিয়তির তাও বুঝি সহ্য হল না। তুমি সৌদিতে যেতে চেয়েছিলে, তাই বিমানের টিকেট, পাঁচ লক্ষ টাকার একটি চেক, আর সৌদি হতে আসা চিঠিখানা রেখে গেলাম। টিকেট ও তোমার প্রয়োজনীয় টাকা রেখে বাদবাকি দিয়ে নুরহানা মেমোরিয়েল নামে একটি এতিমখানা খুলবে। পৃথিবী নামক তোমাদের এই সুন্দর গ্রহটি আমাকে কখনও আলোর পথ দেখায়নি তাইতো ছুটে চললাম অন্য গ্রহহের ঠিকানায়।

আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কর না, খুঁজলে পাবে ও না ....!

* * *

www.pathagar.com

আঁধারের রূপ

চাকরি নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটে চলেছে মাহমুদ আজ প্রায় দুবছর ধরে। দারুণ হতাশা নিয়ে প্রতিদিন ঘরে ফেরে। ভাগ্যিস, পারিবারিক দায়দায়িত্ব নেই। একমাত্র ছোট ভাইটিও গত বছর ম্যালেরিয়ায় পটল তুলেছে। পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তিও অবশিষ্ট নেই, যা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ডিগ্রি নিতে গিয়ে শেষ। সকাল বিকাল ছাত্র পড়িয়ে মেসের খরচ বহন করতে হয় মাহমুদকে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন ?

পত্র পত্রিকায় চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে গত দুবছরে শত শত দরখাস্ত করেছে সে কিন্তু হয়নি একটিও। শুধু একবার একটি প্রতিষ্ঠান রিগ্রেট জানিয়ে উত্তর দিয়েছিল। তবু ভদ্রতারও একটা ভাষা আছে। চাকরি প্রার্থীদের এটাও একটা শান্তনা।

গতকালের ইত্তেফাক-এ চাকরির একটি বিজ্ঞপ্তিতে হিসাবরক্ষক-এর একটি পদে দুপুর বারোটার ভেতর সরাসরি যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কোন নাম নেই।

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই-প্রতিটি ইন্টারভিউয়ের প্রাক্কালে একটি পংক্তি উচ্চারণ করা আজকাল মাহমুদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

সেই সাতসকালে এসে হাজির হয় মাহমুদ গুলিস্তানের মোড়ে। হন্যে হয়ে নির্দিষ্ট ঠিকানা খোঁজে। নম্বর দেখে এগিয়ে যেতে যেতে একশ দশ নম্বর পর্যন্ত এসে থামতে হয়। এর পর খোলা মাঠ। মাঠে পড়ে আছে ইলেকট্রিক থামের পাহাড় আর কেবলস্। কোথায় সেই একশো বারো নম্বর ? এটা কি অফিস না দোকান ? আশেপাশে বগলে বায়োডাটার ফাইল নিয়ে আরো কয়েকজন প্রার্থীর আনাগোনা মাহমুদের দৃষ্টি এড়ায় না। কমপক্ষে দশবার চাকীর প্রার্থীদের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, ভাই একশো বারো নম্বর অফিস কোথায় বলতে পারেন ? প্রশ্নকারীরা তার মুচকি হাসিতেই তাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়ে কেটে পড়ে।

ক্লান্ত দেহখানাকে ফুটপাতের একটি বেঞ্চিতে এলিয়ে দিয়ে আনমনে বাদাম চিবুচ্ছিল মাহমুদ। যানবাহন আর মানুষের এদিক সেদিক ছুটোছুটি। আনুমানিক বিশ হাত দূরে বৃত্তাকারে শুয়ে থাকা পাঁচজন ভিখারীর দল সমবেত কণ্ঠে গানের মাধ্যমে বিকৃত অঙ্গ নেড়ে নেড়ে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ওরা যেন মনুষ্যরূপী এককেকটি কঠিন পাথর। ঝড়, বৃষ্টি, রোদ, রোগ-বালাই ওদেরকে স্পর্শ করে না। ঘড়ির কাঁটার মতই নিয়মতান্ত্রিক তাদের জীবনধারা।

আচমকা করস্পর্শে পিছন ফিরে তাকায় মাহমুদ। পরিষ্কার, সফেদ কাপড় পরিহিত, মুখভর্তি পাকা দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক একগাল স্বর্গীয় হাসিভরা মুখে প্রশ্ন করেন। সেই সকাল থেকেই দেখছি কারোর প্রতিক্ষায় আছেন, তিনি এলেন না বুঝি ? না, মানে .. এখানে একটি অফিস খুঁজছিলাম, কেউ বলতে পারেনা, অগত্যা বসে আছি, কি আর করব? একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নেয় মাহমুদ।

www.pathagar.com

একশত বারো নম্বর অফিস খুঁজছেন ?

আপনি জানলেন কি করে ? পাল্টা প্রশ্ন করে মাহমুদ।

তা জানব না ? বায়োডাটার ফাইল হাতে অনেকেই প্রশ্ন করেছিল আমাকে সেই সকাল থেকেই। সে যাক, একা বসে আছেন, বাড়িতে কেউ নেই বুঝি ? পূর্বে কোথাও চাকরি করেছেন ? একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন করে আগন্তুক ভদ্রলোক দাঁড়িতে হাত বুলান।

মেসে থাকি, পিছটান নেই। আর চাকরির অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইছেন- না তাও নেই। মায়ের পেট থেকে কেউতো আর শিখে আসে না ? লেখাপড়া আছে। কাজের মধ্য সে অভিজ্ঞতা হবে সেটাইতো স্বাভাবিক।

ভদ্রলোককে চিন্তিত মনে হল। ঈশারায় কাকে যেন কাছে ডাকলেন। অসংখ্য জনস্রোতের মাঝে কাকে ডাকলেন তা বুঝা গেল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে বেঁটে, কালো, খোঁচা খোঁচা দাড়িপূর্ণ মাঝারি বয়সের একটি লোক পান চিবুতে চিবুতে সালাম করে কাছে এসে দাঁড়ালো। পরণে নীল হাফ সার্ট ও সাদা লুঙ্গি। কাঁধে নীল রংয়ের ঝুলানো একটি কাপড়ের ব্যাগ। অনেকটা গ্রাম্য পোষ্টঅফিসের ডাকপিওনের মত। মাহমুদের দৃষ্টি এড়ায় না। এই লোকটিইতো আজ সকালে কাগজের ঠোঙ্গা হতে রাস্তায় পড়ে থাকা আঁতুড়দেরকে দুটো করে সিঙ্গারা দিয়েছিল, আর ওরা সুর থামিয়ে সিঙ্গারাগুলো সাবাড় করছিল পরম তৃপ্তিতে।

আমাকে ডাকছিলেন ফাদার ?

হ্যাঁ শোন, এই ভদ্রলোককে একশত বারো নম্বর অফিসে নিয়ে যাও। উনি তাই খুঁজছেন। এবার মাহমুদের দিকে তাকিয়ে বলেন- যান, যান, ওর সাথে যান। ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে। চাকরিতো আপনার খুব দরকার, তাই না ?

মুহূর্তে আগন্তুকের দিকে চেয়ে দৃষ্টি ফেরায় মাহমুদ দাঁড়িওয়ালা ভদ্রলোকের দিকে। বেঁটে লোকটি ভদ্রলোককে ফাদার বলে অভিহিত করল, তাহলে নিশ্চয় তিনি খৃস্টান মিশনারী হবেন। মিশনারীরা নাকি খুব দয়ালূ।

ভাবতে ভাবতে বিনা বাক্যব্যয়ে বেঁটে লোকটিকে অনুসরণ করে মাহমুদ। রাস্তা ক্রস করে খোলা মাঠের পাশে একটি পানবিড়ির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় লোকটি মাহমুদকে নিয়ে। দোকানিকে বলে- ও বেলাল, বেলাইল্লারে .. সুন্দর কইর‍্যা দুটো পান বানিয়ে দেতো?

ঠিক আছে ওস্তাদ। ওনাকে কি ধরনের দেব ?

শুভঙ্কর আর আমাকে মনতোষ- বুঝলি ?

স্যারকে একটু ভাল করে বানিয়ে দিস যেন।

না, পানের অভ্যাস নেই, আপনি খান, আমাকে শুধু অফিসটা দেখিয়ে দিলেই চলবে। কি যে বলেন স্যার ! পান যে খান না তাতো মুখ দেখ্যাই টের পাইছি, কিন্তু বেলাইল্লার হাতের শুভঙ্কর পানটি একবার খাইয়্যা দেখেন না, হারা জীবন মনে থাকব। হাঃ হাঃ বিজ্ঞের মত লাল দাঁত বের করে হাসে লোকটি।

মাহমুদের হাসি পাচ্ছিল পানের নাম শুনে। শুভঙ্কর, মনতোষ- পানেরও আবার শুদ্ধ

www.pathagar.com

নাম! অনেক কষ্টে হাসি সংবরণ করে পানটা হাতে নিল ভদ্রতা রক্ষার্থে। অনভ্যস্ত মুখে পানটি চিবাতে লাগল পরম যত্নে। একটা নাম না জানা খুশবু মগজে গিয়ে আমেজ ছড়ায়।

দে, চাবিটা জলদি দে, দেরি করবি না, আদেশের সুরে বলে লোকটি।

চাবি খুঁজতে গিয়ে পাঁচমিনিট লেগে যায় দোকানির। মাহমুদের দৃষ্টি যেন এরই মধ্যে ঝাপসা হয়ে আসছে। চোখ দুটো টলমল করছে প্রবল ঘুমের আমেজে। সামনে দাঁড়ানো একটি রিক্সাকে পাঁচটি মনে হচ্ছে। জড়ানো কণ্ঠে বলে, চলুন আর দেরি করবেন না। আমাকে অফিসটা দেখিয়ে দিলেই চলবে

বেঁটে লোকটি দোকানের পাশের একটি দরজা খোলে আলতোভাবে। মাহমুদের দিকে চেয়ে বলে, কি স্যার বলছিলাম না, এ দোকানের পান খেলে জীবনে আর ভুলতে পারবেন না। আর আমাদের বেলাল যাকে আমরা বলি পানের রাজা। এই ঢাকা শহরে তার মত কেউ পান বানাতে পারে না।

মাহমুদের চোখে সর্ষে ফুল। শুভঙ্কর নামের পানটি কি সত্যিই তার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিল ? কি দরকার ছিল পান খাওয়ার। একটু জোর দিয়ে বললেই হতো- ধন্যবাদ, পান খাওয়ার অভ্যেস নেই। লোকটিকে খুশি করার কোন প্রয়োজন ছিল না। এখন যা হবার হয়েছে- জড়ানো কণ্ঠে বলল, আমাকে একটু ধরুন, মোটেই দেখতে পাচ্ছি না।

ঘাবড়াবেন না স্যার। এই একটু আধটু গাঁইট লাগছে- পানি খাইলেই সাইর‍্যা যাইব। আমার কান্ধে ধইর‍্যা আহেন, কোন অসুবিধা অইব না।

মাহমুদর মনে হল সিঁড়ি বেয়ে সে নিচের দিকে নামছে। চোখটা বুজে আসছে অসারতায়। মনে হচ্ছে অন্ধকার একটি কক্ষের মধ্য দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। দু-একটি ইঁদুর ছুটতে গিয়ে যেন হোঁচট খেলো। কিছু সময়ের ব্যবধানে আরেকটি দরজা খোলার শব্দ হল।

অন্ধকারে ভয় পাচ্ছেন স্যার ? লোকজনতো এহানে থাহে না, তাই আইন্ধ্যার। দাঁড়ান, এহনই লাইট জ্বালামু- আইন্ধ্যার দুর অইয়া যাইব।

সুইচ টিপার শব্দ হতেই নিয়ন লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে ঘরটি। সোফাশোভিত কার্পেট মোড়া কক্ষটি। পরিপাটি করে সাজানো।

এহানে বইয়া থাহেন স্যার। ফাদার আইলে আপনারে তলব করব। আমার কাম শেষ। এহন আসি স্যার।

মাহমুদের মাথা ঘুরছে। চোখের সামনে একটি লাইট হাজারো লাইট হয়ে জ্বলছে।

মাইক্রোফোনের আওয়াজে চমকে উঠে মাহমুদ। কে যেন ভারিক্কি গলায় বলে উঠল- ডান দিকের ওয়ালের উপর যে ছোট্ট লাল লাইটটি বিন্দুর মত জ্বলছে ঠিক তার নিচে এসে দাঁড়ান। দরজা ফাঁক হলে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ভিতরে ঢুকে পড়বেন।

মাহমুদের বুঝতে অসবিধা হয় না টি. ভি ক্যামেরার মাধ্যমে তার গতিবিধি কেউ লক্ষ্য করছে ভেতর হতে। মাথাটা চেপে ধরে হুকুম তামিল করল সে শরীরে এক প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে।

ভেতরে ঢুকা মাত্র ঠিক তার সামনে দেখতে পেল পিঞ্জরাবদ্ধ এক ময়না। ডানা ঝাপটিয়ে

www.pathagar.com

ঘাড় কাত করে দু-কান ফুলিয়ে বলল- যীশুর কৃপায় আপনার মঙ্গল হোক। সামনে বাড়ুন, ফাদার সায়মন আপনার অপেক্ষায় আছেন, কথা নয় কাজ- শুভরাত্রি।

একটা পাখি এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে তা স্বকর্ণে শুনে মাহমুদের বিস্ময়ের ঘোর কাটে না।

করিডোর পেরিয়ে দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দেয়।

ভিতরে আসুন।

বিশমিনিট পূর্বে যার সাথে দেখা হয়েছিল ফুটপাতে- স্বর্গীয় চেহারার সে লোকটিকে সামনে দেখে একটু আশ্বস্ত হয় মাহমুদ। কেমন করে তার আগে পৌঁছে গেল লোকটি ! নিশ্চয়ই এখানে ঢুকার জন্য গুপ্ত কোন রাস্তা রয়েছে।

মনের ভাব গোপন করে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে বলে- এটাই তাহলে ১১২ নং অফিস ? ওরে বাবা কার সাধ্যি খুঁজে পায় ? সে যাক- আমাকে কি কিছু বলার জন্য ডেকেছেন ফাদার ?

এত অস্থির হবেন না। তাড়াহুড়া আমি মোটেই পছন্দ করি না। দেখুন এ প্রতিষ্ঠানে চাকরির কয়েকটি শর্ত আছে। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে সেগুলো মেনে চলতে হয়। আপনার পিছটান নেই, সেই সকাল হতে অফিসটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন- এ ধরনের লোকই আমাদের পছন্দ। এই নিন চাকরির শর্তাবলী- মনঃপুত হলে সই করে আজই জয়েন করতে পারেন।

কোন কথা না বলে মাহমুদ হাত বাড়িয়ে নেয় কাগজগুলো। চোখ রগড়াতে রগড়াতে নীরবে চোখ বুলায়। গোপনীয়তা রক্ষা, অনধিকার চর্চা না করা, ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোতে ছুটি না নেয়া, বর্তিত কাজের বাইরে আগ্রহ প্রকাশ না করা, সঠিক হিসাব রাখা, প্রতিদিন সেইলস সেন্টার থেকে আগত টাকাপয়সা ব্যাঙ্কে জমা দেয়া, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে বন্ধুবান্ধবকে অফিসে না আনা বা অফিসের ঠিকানা না দেয়া ইত্যাদি।

চাকরির সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে ঃ মাসিক বেতন ছয় হাজার টাকা, আর্থ বছরের শেষে দুমাসের বেতনের সমান বার্ষিক বোনাস, খাওয়া, থাকা ও চিকিৎসা ফ্রি ইত্যাদি।

বেতন মাসিক ছহাজার ! বোনাস ! খাওয়া থাকা ফ্রি ! দেখতে ভুল হয়নিতো ? অবিশ্বাস্য প্রস্তাব! আবেগ দমন করে রাখতে হবে হাবে ভাবে। দুবছরের বেকারত্বের জ্বালা তার চেয়ে ভাল কে বুঝবে ? আর শর্তগুলো এমন কি ? সব শর্তই তার রুচির আওতায় পড়ে।

কি রাজি ? পারবেন তো ?

আশা করি সামলে নিতে পারবো ফাদার সায়মন। আপনার আশীর্বাদ থাকলে অবশ্যই পারবো। কথায় জোর দিয়ে বলে মাহমুদ।

আমার নাম জানলেন কি করে ? মজিদ মিয়া বলেছে ? খুবই বিশ্বস্ত লোকটি। বিশ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। তার কাছেই সব টাকা পয়সা জমা দেয়ার ভার।

শুধু মজিদ মিয়াই বলেনি। ঐ পোষা পাখিটিও কিন্তু আপনার নাম সুন্দর করে বলতে পারে।

www.pathagar.com

ওহ হ্যাঁ- পাখিটি আমার খুব শখের। যা শুনে তা অনর্গল বলতে পারে। দারুণ স্মৃতিশক্তি ওর। এক গরীব লোক বেশ কবছর আগে আমাকে এটি দান করেছিল। যাকগে- আপনি তাহলে রাজি ?

খুশিতে ও কৃতজ্ঞতায় উপচে ওঠে মাহমুদের চোখ। মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। খচ খচ করে দস্তখত করে কাগজখানা বাড়িয়ে দেয় ফাদার সায়মনের দিকে।

কলিং বেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে মজিদ মিয়া পান চিবুতে চিবুতে সামনে এসে দাঁড়ায়।

কি রে মজিদ, ওনাকে পান খাইয়েছিস নাকি ? চোখমুখের অবস্থা দেখি একেবারে খারাপ করে দিয়েছিস।

অভ্যেস নেই, মজিদ মিয়ার অনুরোধ ফেলতে পারিনি, মনে হয় গাঁট লেগেছিল লজ্জিত মুখে নিচের দিকে তাকিয়ে বলে মাহমুদ।

ঠিক আছে। এখন একটু রেস্ট নিন। শরীর যখন খারাপ লাগছে তখন আর বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।

আমারতো নিজের বলতে কেউ নেই ফাদার। তবে মেসের বন্ধুবান্ধবরা বাসায় না ফিরলে চিন্তা করবে .. এই যা।

এজন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে মজিদ মিয়া মেসে খবর পৌঁছাবে। মজিদ মিয়ার দিকে ফিরে বলেন, ওনার খবরটা আজ রাতেই পৌঁছাবে। আমি উঠি। শুভরাত্রি। যীশু আপনাদের মঙ্গল করুন। একটি স্বর্গীয় অনুভূতি ছড়িয়ে ফাদার সায়মন নিষ্ক্রান্ত হলেন।

পানের রস গলধঃকরণ করে মজিদ মিয়া বলে ওঠে, বুঝলেন স্যার, ফাদার খুব ভালা মানুষ। মুসলমান ছিলেন, বিশবছর আগে খৃস্টান অইছেন- এখন পাদ্রি। ওনার উপদেশ হল .. কথা, নয় কাজ। আমার খুব ভয় করে ফাদারকে। এমনিতে ভালা, বরফের লাহান ঠান্ডা, কিন্তু রাইগ্যা গেল আর রক্ষা নেই। এক্কেবারে যেন আগুনের লুক্কা। ফাদার বলেন- মজিদ, সকালে ঘুম হনে উইঠ্যা কয়েকজন আঁতুড় দেইখ্যা খাওন দিয়া কামে লাগবা, দেখবা তোমার হারাদিন ভালা যাইব। আঁতুড়দের মাঝে নাকি গড্ লুকাইয়া আছেন ! এমন মানুষ যদি সারাদেশে আরো কিছু থাকতো তা অইলে দেশে আর ভুখা থাকতো না। ঠিক আছে স্যার, চলেন আপনার রুমে। আমার আবার অন্যখানে যাইতে অইব।

মজিদ মিয়া ও ফাদার সায়মনের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে মাহমুদের। জীবনে কত আঁতুড়, ইয়াতীম, মিসকীন দেখেছে সে। দূর দূর করে তাড়ানো ছাড়া আর কি করেছে সে ? ওদের সাথে তুলনা করলে নিজেকে বড় অপরাধী ও ছোট মনে হয়।

পাশেই সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো একটি রুমে ঢুকেই মজিদ ডাকে, মতি মিয়া ও মতি ভাই, কই গেলা ?

উর্দি পরা একটি লোক তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকে। নতমস্তকে অভিবাদন জানিয়ে বলে ঠিক আছে মজিদ, ভাই তুমি কাজে যাও। স্যারেরে আমি সামলামু। ফাদার আমাকে ওনার

www.pathagar.com

সম্পর্কে বলে গেছেন। কোন অসুবিধা হবে না।

এবার মাহমুদের দিকে চেয়ে মজিদ মিয়া বলে, আমি নিজে মেসে গিয়া খবরটা দিমু। আর ফেরার পথে আপনার কাপড় চোপড়ও নিয়ে আসমু স্যার। চিন্তার কোন কারণ নেই, শুধু একটা চিট লেইখ্যা দেন স্যার।।

মতিমিয়া সোফাকে একটু টেনে গায়ে ঝালর লাগানো পর্দা সরিয়ে বাটনে টিপ দিতেই একটি লিফট এসে দাঁড়ালো। মাহমুদ ভাবে এই লিফটে করেই ফাদার তার আগে এখানে এসেছিলেন। লিফটের গায়ে কোন নম্বর নেই। কখনো মনে হয় লিফট উপরে যাচ্ছে, আবার কখনোবা নিচে। কোনরূপ ভাবনার অবকাশ না দিয়েই লিফটের দরজা খুলে গেল। মতি মিয়া মাহমুদকে থাকার রুম ও অফিসকক্ষ দেখিয়ে দিল। সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো রুম দুটো।

পছন্দ হয়েছে স্যার ? কলিং বেল টিপলেই বান্দা হাজির হব। এখন চা নাস্তা পাঠিয়ে দেব স্যার ?

তা দাও, তবে বলতো তোমরা সবাই এত ভাল কেন?

কি যে বলেন স্যার। ফাদারের স্পর্শে খাঁটি সোনাও গিনি হয়ে যায় আবার গিনি সোনাও খাঁটি হয়ে যায়।

তার মানে ?

মতি মিয়া কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়।

শর্তের কথা মনে হওয়াতে মাহমুদ আর কথা বাড়ায় না। নীরবে অফিস কক্ষ ঘুরে দেখে। এই ভালো। বাইরের কোলাহল নেই, আপন ভূবন। এটাইতো মাহমুদের অনেকদিনের স্বপ্ন।

জীবনটা কত বিচিত্র। কখন কি আকস্মিকভাবে ঘটে যায় তা কেউ বলতে পারে না। নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাগ্যের এ পরিবর্তনের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে মাহমুদ।

একরাশ ক্লান্তি ঝেড়ে নিজেকে খুব উৎফুল্ল মনে হয় মাহমুদের। ফাদার সায়মন কি তাকে অনেক বেলা করে উঠতে দেখে গেছেন? তাড়াতাড়ি বাথরুম সেরে অফিসকক্ষে ঢুকে সে। মতিমিয়া ঘরে ঢুকে ট্রে ভর্তি নাস্তা নিয়ে। ফাদারের কথা জানতে গিয়েও উৎসাহ দমন করে মাহমুদ। চাকরির শর্তকে সামনে রেখেই চলবে সে।

অফিসকক্ষে ঢুকে দেখে টেবিলের এক কোণে পড়ে আছে নীল কাপড়ের কয়েকটি ব্যাগ। এদের প্রতিটিতে লিখা রয়েছে বিভিন্ন সেইলস্ সেন্টারের নাম। মৌচাক, ঝিকাতলা, নীলক্ষেত, মহাখালী ইত্যাদি। টেবিলের উপর ক্যাশবই, ফাইলপত্র ও কাগজকলম পাশাপাশি সাজানো। পেপার ওয়েটের নিচে একটি কাগজে লিখা রয়েছে, হিসাবনিকাশ শেষ করে দুপুরের পূর্বেই ব্যাংকে জমাদানের ব্যবস্থা করবেন।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। ত্রস্থ হাতে প্রতিটি ব্যাগ এক এক করে খুলে অগণিত কাঁচা পয়সা ও টাকা গুণা শেষে প্রতিটি সেন্টারের বিপরীতে ক্যাশবইয়ে এনট্রি দেয় মাহমুদ।

দুপুর বারোটার দিকে মজিদ মিয়া অফিস কক্ষে ঢুকে বলে, স্যার টাকা গুণা অইছে ? ব্যাঙ্কে যাইতে অইব এক্ষুণী।

হ্যাঁ, সব কাজ শেষ। এক্ষুণি নিয়ে যেতে পারেন।

বিশহাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা বিশ পয়সার ব্যাংক স্লিপ মজিদ মিয়াকে সমজিয়ে অন্যান্য কাজে মগ্ন হয় মাহমুদ। ফাদারের কাছে প্রমাণ করতে হবে তাকে রিক্রুট করে তিনি ঠকেননি।

www.pathagar.com

কাজ অনেক। তবু কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে মাহমুদের ভাল লাগে। কোলাহলমুক্ত, পরিচ্ছন্ন, নির্ঝঞ্ঝাট এক জীবন। মাসের শেষ সপ্তাহে এবং ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোতে কাজের চাপ একটু বেশি। ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলোতে বিশেষ করে শবেবরাত এবং ঈদের দিনে মজিদ মিয়া অসংখ্য টাকার ব্যাগ নিয়ে আসে। বলে, স্যার, ট্যাহা গুইণ্যা কূল কিনার পাইবেন না। এই দিনগুলোতে ফাদারের মন খুব ভালা থাহে।

ফাদারের সাথে দেখা হয় মাহমুদের সপ্তাহে দু-একদিন ক্যাশবইয়ে সই নিতে গিয়ে। উনি খুশি আছেন তার কাজে এটা সে হলফ করে বলতে পারে। দেখা হলেই কুশলবার্তা জানেন আর যীশুর কাছে মঙ্গল চেয়ে আশীর্বাদ করেন।

সেদিন সকালে ক্যাশ বইয়ে সই নিতে গেলে মজিদমিয়া আকস্মিক ভাবে আট-নয় বছরের একটি অন্ধ ছেলেকে পাঁজাকোলা করে ফাদারের সামনে এসে হাজির হয়। দরদ মেশানো কণ্ঠে বলে- অন্ধ, দুটো চক্ষুই নেই, এই অভাগাটারে কোথায় পাঠামু ফাদার ?

স্নেহাদ্র কণ্ঠে ফাদার পবিত্র দু-ঠোঁটে চুক চুক করে বললেন, কোন অপারেশন কেন্দ্রে ছেলেটির অপারেশন হয়েছে ?

হাটখোলা অপারেশন কেন্দ্রে, ফাদার।

ঠিক আছে। কিছুদিন ওকে মোহাম্মদপুর এতিমখানায় রেখে সুস্থ করে মহাখালী সেইল্‌স সেন্টারে পাঠিয়ে দেবে, বুঝলে? চোখ মুদে বললেন, ওহ যীশু তোমার করুনা হোক।
মজিদ মিয়া কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ফাদার ধমকের সুরে বললেন, যা বলছি তাই করো। কথা নয় কাজ। এবার যেতে পার।

ফাদার চোখ বুজে কি যেন ভাবছেন। এক স্বর্গীয় দ্যুতি চোখেমুখে যেন ঠিকরে পড়ছে। মাহমুদ চোখ ফেরায় মজিদ মিয়ার কোলে লেপটে থাকা অন্ধ ছেলেটির দিকে। নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে ছেলেটি। চোখের পাতা পর্যন্ত গর্ত হয়ে এক ইঞ্চি নিচে নেমে গেছে।

ফাদারকে পীর দরবেশ মনে হয় মাহমুদের। পীর দরবেশ কখনো চোখ দেখেনি সে, তবে এমন গুণের অধিকারী মুনষ পীর দরবেশ না হয়ে পারে না ? শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে মাহমুদের মাথা। নতজানু হয়ে ফাদারের পা ছুঁয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বলে, যতটুকু আপনাকে জানি তার চেয়ে বেশি মহান আপনি। আমার কেউ নেই ফাদার এ পৃথিবীতে। দোয়া করুন আমার জন্য, বাকি জীবন আপনার পাশে থেকে যেন দুঃস্থের সেবা করে যেতে পারি ঠিক আপনার মত ।

উঠুন। যীশু আপনার মঙ্গল করুন। সিলেট ও চট্রগ্রামের সেইল্‌স সেন্টারের কর্মচারীদের বেতন পাঠিয়ে দিয়েছেন ?

জ্বি, ফাদার।

তা ভালো। যাদের মাধ্যমে আমরা বেঁচে আছি তাদের প্রাপ্য সময়মত দেওয়াই উত্তম। কিছুদিনের মধ্যে আমি সিলেট ও চট্রগ্রামের বিভিন্ন পীর আউলিয়াদের মাজার পরিদর্শনে যাব বলে ভেবেছি। ওদের দ্বার সবার জন্য উন্মোক্ত। ওরা সর্বকালের উত্তম পুরুষ, বুঝলেন ?

আমার মত গোনাহগার কেমন করে বুঝবে ফাদার ? নত মস্তকে উত্তর দেয় মাহমুদ।

মাহমুদের আজ এক বছর পূর্ণ হল। ফাদার তার কাজে খুশি আছেন বলে মনে হয়। হাবেভাবে মাহমুদ তা আঁচ করতে পেরেছে। বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছে সে, ঠিক শর্তানুযায়ী। কাজের মধ্যে এমনি সে ডুবেছিল যে, গত এক বছরে পরিচিত বন্ধুদের কারোর সাথে দেখা করতে পারেনি। অফিস শেষে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত অফিস সংলগ্ন ফাদারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে বই নিয়ে বসা তার নিত্যদিনের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফাদার নিজেই তাকে অযথা সময় নষ্ট না করে জ্ঞান পরিপক্ক করার জন্য বইয়ের মধ্যে ডুবে

www.pathagar.com

থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। বর্ষপূর্তিতে মেসের বন্ধুদের সাথে দেখা করে এলে কেমন হয় ? ফাদারের অনুমতি নিয়ে কালই যাবে সে।

পরদিন ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মাহমুদ- মহাখালীর মেসের উদ্দেশ্যে। মতিমিয়ার সহায়তায় অন্ধকার সুড়ঙ্গ পেরোতেই দেখতে পেল সেই ফুটপাত, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, হাজার হাজার ফেরিওয়ালা আর অসংখ্য লোকজনদের সমাগম। মতি মিয়া গেটে তালা দিতে দিতে জানালো, কাল সকাল ঠিক দশটায় পানবিড়ির দোকানের কাছ হতে মাহমুদকে নিয়ে যাবে। গেটের চাবি একটাই যা মতিমিয়ার জিম্মায়। মেসে ঢুকতেই পুরোনো বন্ধুদের তিনজনকেই পেল। ইতোমধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে মেসের। তিনজনের মধ্যে দুজনের ছোটখাটো চাকরি হয়েছে। মাহমুদকে পেয়ে সবাই জাড়িয়ে ধরে আনন্দে ।

কি-রে, এতদিন কোথায় ছিলি ? তোর মত নেমকহারাম আর দুটো দেখিনি। সেই কবে বছরখানেক আগে একটি লোক এসে তোর চাকরিতে জয়েন করার কথা বলে গেল, কিন্তু কোথায় তা বলতে পারল না। নতুবা আমরা গিয়ে না হয় দেখে আসতাম। মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখে জানাতে পারতিস- কোথায় আছিস, কেমন আছিস ?

তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তোদের কাছে প্রথমেই। তবে বিশ্বাস কর, দম ফেলার অবসরই ছিলো না। চাকরিস্থল ঢাকার বাইরে থাকায় ঢাকার সাথে একরকম সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছিলাম..।

ঢাকার বাইরে হতে পারে, কিন্তু সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে নয়তো ? কত আর জোড়া লাগাবি শালা। সোজা কথা বললেই হয়, চাকরিও করছি, প্রেমেও হাবুডুবু খাচ্ছি। মুস্তাকের কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠে।

চাকরি যে ভাল বাগিয়েছিস তা তোর কাপড়চোপড় আর পকেটে বেনসন সিগারেট দেখেই বুঝে নিয়েছি। ফোড়ন কাটে খোকন।

তুইতো শালা সিগারেট ছাড়া আর কিছুই চিনিস না। নে, যত ইচ্ছা টান, দেখি আজ কত টানতে পারিস ! বেনসনের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দেয় মাহমুদ খোকনের দিকে।

এখন বল- তোকে কি দিয়ে আপ্যায়ন করতে পারি ? মেসের খাওয়া কি আর তোর পছন্দ হবে ? অন্যান্যদের দিকে চেয়ে চোখ টিপে শাহেদ।

পৃথিবীর পরিবর্তন হলেও তোর খোটা কথা বলার অভ্যাসটা পরিবর্তন যে হবে না তা হলফ করে বলতে পারি। এক কিল লাগাবো পিঠে বলে দিলাম। যাক, অনেকদিন হল তোদের সাথে খাইনি। মহাখালীর চাইনিজ ড্রাগন আজ তোদের জন্য অপেক্ষা করছে। দেখি কত বিল তুলতে পারিস ! পেট চুক্তি, বুঝলি ? আর দেরি নয়, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে...খালি পেটে আর কত জমবে ? আমার বসের কথা, কথা নয় কাজ।

সত্যি বলছিস নাকি ? চাইনিজে নিয়ে খাইয়ে দাইয়ে বিলের ভয়ে যদি বিড়ালের মত পালিয়ে যাস তাহলে আমাদের তিনজনের শরীরের চামড়া বেচতে হবে তা বলে রাখলাম। মুস্তাকের কথায় সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

বললামতো পকেট ভারি। একদিনের জন্য এসেছি। যা ইচ্ছে খাবি, কোন বাধা নেই। মোরা মুক্ত স্বাধীন, বন্ধনহীন .....আর বিড়ালের মত পালিয়ে যাব কেনরে ? কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে বিল পরিশোধ করব দেখে নিস। মাহমুদের কথায় আবারো হাসির ঢেউ।

চাইনিজ ড্রাগনে চার বন্ধুতে মিলে খাওয়ার পালা চুকিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায় সবাই। রাত অনেক হয়েছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আর থেকে থেকে মেঘের গর্জন।

যা খেয়েছি শালা তিনদিন মেসের চুলো বন্ধ রাখতে হবে। শাহেদ পেটে হাত দিয়ে বড় বড় ঢেকুর তোলে। আকস্মিক ভাবে মাহমুদের দৃষ্টি থেমে যায় দূরের এক লাইটপোস্টের

www.pathagar.com

নিচে। অন্ধকার আকাশ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে যায় দ্রুত। নজর তার এড়ায় না। লাইটপোস্টের নিচে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে এক অন্ধ কিশোর যাকে সে দেখেছিল ফাদার সায়মনের সামনে মজিদ মিয়ার কোলে পাঁজাকোলা অবস্থায়। ফাদার বলেছিলেন ট্রেনিং শেষে মহাখালী সেইলস্ সেন্টারে পাঠিয়ে দিও। চাদরে আবৃত মজিদ মিয়া ছেলেটির সামনে থেকে কাঁচা পয়সা নীল ব্যাগে পুরছে।

আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ে মাহমুদের মাথায়। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে ততক্ষণে। রাস্তার বাতি নিভে গেছে। ত্রস্তপদে মজিদ মিয়ার সামনে এগিয়ে যায় সে। বিদ্যুতের আলোয় ভুত দেখার মতই চমকে উঠে মজিদ মিয়া।

স্যার আপনে ?

হাঁ আমি ! কিছু লুকাতে চেষ্টা করো না আর। ফাদারের কাছে নিয়ে চল আমাকে। শেষ বুঝাপড়া করতে হবে ঐ শয়তানটার সাথে।

মজিদ মিয়ার হাত দ্রুত চলে যায় তার নীল সার্টের পকেটে। বলে, ফাদারের সাথে শর্তের কথা ভুইল্যা গেছেন ? শর্ত ভঙ্গকারীকে আল্লাহ একদম পছন্দ করেন না।

কি ? শয়তানের মুখে আল্লাহর নাম ! মজিদ মিয়ার দিকে দুপা এগিয়ে যায় মাহমুদ। অজান্তে দুহাতের মুষ্টি হয় সুদৃঢ়।

কোথায় যেন বাজ পড়ল ভীষণ শব্দে। অন্ধকারের বুকে বিদ্যুতের আলোয় মজিদ মিয়ার চোখ দুটো জ্বলে উঠে চিতাবাঘের ন্যায়। ফাদারের কাছে যাবেন, সে সুযোগতো অইবো না মিয়া-ভাই?

বিকট শব্দ করে আবারো বিদ্যুৎ চমকালো। মজিদ মিয়ার হাতের বুভুক্ষ যন্ত্রটি প্রতিশব্দে গর্জে উঠল। লুটিয়ে পড়ে হুমড়ি খেয়ে একটি রক্তাক্ত দেহ অন্ধকারে লাইট পোস্টের নিচে। মেলে থাকা স্থবির দুটো চোখ যেন খুঁজতে থাকে আঁধারের প্রকৃত রূপ।

*   *   *

www.pathagar.com

যবনিকার অন্তরালে

শেরেগুল খাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা মুহূর্তে কেটে যায় ভারি বুটের পদশব্দে। তারই অন্ধকার সেল-প্রকোষ্ঠ বরাবর ক্রমশ শব্দগুলো এগিয়ে আসছে। এত ভোরে কারা আসছে ? জেদ্দার বৃমান কারাগারে দীর্ঘ তিনমাসের বন্দী জীবনে কাক ডাকা ভোরে কোন নিরাপত্তা প্রহরীর আনাগোনা সে কখনো লক্ষ্য করেনি ইতঃপূর্বে। নাকি বিপদ মুক্তির কোন শুভ সংকেত ? আশার আলোয় লাল হয়ে যাওয়া তার চোখ দুটি দপ করে জ্বলে উঠে মুহূর্তে। অনিবার্য বিপদ থেকে দলের লোকজনদেরকে উদ্ধারের জন্য জেদ্দায় তাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত কমান্ডোবাহিনী বিভিন্ন প্রফেশনে কর্মরত রয়েছে। তিনবছর পূর্বে কলম্বিয়ার পুলিশ কাস্টডি হতে আকস্মিক হামলা চালিয়ে দলের কমান্ডোরা তাকে মুক্ত করেছিল এমনি এক ভোরে।

ফজরের আজান প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দিকে দিকে। অন্ধকার সেল-প্রকোষ্ঠে অনিদ্রায় শেরেগুলের ত্রিশ বছরের টনটনা যৌবনের ভাঁজে ভাঁজে পড়েছে ক্লান্তির ছাপ। অপদার্থ কমান্ডোদের অহেতুক উদাসীনতাই এর জন্য দায়ী। ওরা এত দেরি করছে কেন ?

কি সংঘবদ্ধ দল তাদের ! সপ্ত মহাদেশের অগণিত রাজধানীতে জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের হিট স্কোয়ার্ড। স্পেশাল ট্রেনিং রয়েছে এদের। পথের কাঁটা চিরদিনের মত সরিয়ে দিতে এদের জুড়ি নেই। এ জগতের বাসিন্দাদের এক ভিন্নতর জীবন। একবার এর সদস্য হয়ে গেলে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত দলে থাকতে হবে, নতুবা অবধারিত মৃত্যু।

মুক্তির চিন্তার পাশাপাশি অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা একে একে মনে পড়ে শেরেগুলের। কাবুলের এক সাধারণ হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে চাকরির জন্য কত ধর্ণাই না দিতে হয়েছিল তাকে। ছোটবেলা পিতাকে হারিয়ে মার চেষ্টায় সে মেট্রিক পর্যন্ত কোনরকম এগিয়েছিল। অভাবী সংসার। পৈতৃক সম্মত্তি এক রকম নিঃশেষ। স্বসম্মানে বেঁচে থাকার জন্য একটা চাকরি তার একান্ত প্রয়োজন।

চাকরি খুঁজে খুঁজে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে একদিন বাড়ি ফেরার পথে মার্সিডিস গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিল রাস্তার একাপাশে। গাড়ি চালক নিজে ভিড় ঠেলে তাকে কোলে তুলে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যান। জ্ঞান ফিরে দেখে তার এক হাতে ব্যান্ডেজ। পাশে গগলস ও স্যুট পরিহিত সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। স্নেহপ্রবণ কন্ঠে বললেন, খুব বেশি ব্যথা পেয়েছ ? না, ঘাবড়ানোর কারণ নেই। ডান হাতে একটু ফ্রাকচার হয়েছে এই যা। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না। চিকিৎসার যাবতীয় খরচ আমিই বহন করব। বাড়িতে কে আছে তোমার, তাদেরকে কি খবর দিতে হবে ?

ভদ্রলোকের মমতা মাখানো কথায় সব ব্যথা ভুলে যায় শেরেগুল। পিতার চেহারা ঠিক তার মনে নেই। ফটোতে দেখেছিল পিতাও তার এমনি সুন্দর চেহারার সুপুরুষ ছিলেন। প্রতিবেশীরা বলত, ছেলেটি হয়েছে ঠিক তার বাপের মত। চেহারা নিয়ে শেরেগুল কখনও মাথা ঘামায়নি। মা-কে খুশি রেখে চলতে শিখেছে সে। এমন মা কারোর হয় না। এ নিয়ে

www.pathagar.com

তার গর্বও অনেক। একমাত্র ছেলের মুখের পানে চেয়ে মা আর বিয়ে বসেননি। অথচ তার শৈশবের বন্ধু হেকমতের পিতৃবিয়োগ হওয়ার পর মা অন্যের গলে মালা পরিয়েছেন ছমাসের মাথায়। যাকে নিয়ে তার এত গর্ব সে মা-কে মনে পড়াতে অসংকোচে ভদ্রলোককে নিজের বাড়ির ঠিকানা বলে দেয়।

ঠিক আছে, এ নিয়ে তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তোমার মা-কে তোমার হাতে ব্যথা পাওয়ার ক্ষতিপূরণসহ যথাসময়ে খবর দেয়া হবে, কেমন ? হবে বলতো, এমন করে অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছিলে কেন ? চাকরির ব্যর্থতার কথা বলতে গিয়েও শেরেগুল থেমে যায়। ছিঃ ভদ্রলোক এতকিছু করছেন, এরপরও নিজের দৈন্যদশার কথা বলা কি ঠিক হবে ? কিন্তু ভদ্রলোক যেন নাছোড়বান্দা। ভেতরের কথাগুলো আস্তে আস্তে টেনে বের করলেন এক মোহনীয় শক্তি প্রয়োগ করে।

তিনদিন পর হাসপাতালে এসে ভদ্রলোক হাজির। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন- চলো, আর দেরি নয়। তোমার মায়ের সাথে দেখা করে সোজা আমার ঠিকানায় কাল চলে আসবে। চাকরিতো তোমার দরকার, তাই না ? সে হয়ে যাবে। ড্রাইভার তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে এবং পরদিন আবার নিয়ে আসতে যাবে- প্রস্তুত হয়ে এসো- কেমন ?

ভদ্রলোকের কথাগুলো পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বেই ড্রাইভারের ডাকে অগ্রসর হতে হয় শেরেগুলকে। নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা নিয়ে পুলিশ কেইস হয়েছে। ভদ্রলোকের কোন দোষ নেই। সব তারই কর্মফল। কেন অন্যমনস্ক হয়ে সে রাস্তা ক্রস করছিল ? হ্যাঁ, কাল এসে পুলিশকে বলবে তারই দোষ ছিল। অমন অমায়িক ভদ্রলোকটির গায়ে দোষের আঁচড় লাগতে সে দেবে না।

বাড়িতে ঢুকে মায়ের কাছে যা শুনল তাতে শেরেগুলের চোখ ছানাবড়া। মা বললেন, জোর করে ভদ্রলোক দশহাজার রুপীয়া হাতে দিয়ে গেলেন, কোনরূপ ওজর আপত্তি শুনতে চাইলেন না। তাছাড়া তোর চাকরিরও নাকি কান্দাহারে ঠিক করে রেখেছেন। কালই নাকি জয়েন করতে হবে।

একেই বলে তকদির। পরদিন ভদ্রলোককে সালাম করে কাবুল হতে সোজা কান্দাহার ইয়ং এন্টারপ্রাইজ-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় শেরেগুল। জয়েন করার পরদিনই তাকে এক বছরের ট্রেনিংয়ে পাঠানো হয় কান্দাহারের পার্বত্য কোন এক আস্তানায়। পুরোপুরি এক বছর ট্রেনিং। অফিসে মায়ের ঠিকানা লিখে দিয়ে যায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। মায়ের কাছে নাকি ট্রেনিং প্রিয়ডে প্রতিমাসে এক হাজার রুপীয়া করে পাঠাবে কোম্পনি। শেরেগুলের মনে হয়, তকদিরের ফের যতটুকু গড়াতে পারে বুদ্ধি কিংবা চিন্তা ততটুকু পারে না।

বছরান্তে শেরেগুল নিজেকে আবিষ্কার করে কঠিন এক আবেষ্টনীর মধ্যে সে একটি রবোট বিশেষ। যা বলা হবে তার বাইরে কিছু করা যাবে না। সহজ সরল মনের গোপন কোণটি যেন এই এক বছরে এক কঠিন আবরণে ঢাকা পড়েছে। সব ট্রেনিংই সে শেষ করেছে। চারপাঁচটি ভাষায় অনর্গল কথা বলা থেকে শুরু করে স্যুটিং, জুডো, কারাতে, এ্যক্রোবেট- সবকিছু। ট্রেনিংয়ের শেষ দিনটি ছিল বড়ই ভয়ঙ্কর। চিড়িয়াখানার বাঘের

www.pathagar.com

খাঁচার মত একটি খাঁচাতে প্রবেশ করতে বলা হলে বিনা বাক্যব্যয়ে। নির্দেশ পালন করতে হয় তাকে। নির্দেশের সাথে সাথে অ্যাকশন। এটাই এখানকার নিয়ম।

খাঁচায় ঢোকা মাত্রই সামনে ভয়ঙ্কর চেহারার হিংস্র একটি জার্মান সেফার্ড হানটিং ডগ দেখতে পেয়ে শেরেগুলের গায়ের লোমগুলো প্রবল ঝাকুনি দিয়ে খাড়া হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ড কাঁপতে থাকে নিরুপায় হয়ে। এক্ষুণি যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে শেরেগুলের ঘাড়ে হিংস্র কুকুরটি। মটকে দেবে মুহূর্তে নাজুক ঘাড়টি। নাদুস নুদুস শরীরটি নিয়ে রক্তের হুলিখেলায় মত্ত হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। কটমট করে তাকাচ্ছে। যেন বলছে, কোথায় যাবে যাদু ? দেখি কতবড় বাহাদুর ? পিঞ্জরার বাইরে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন ওস্তাদ। তাহলে কি শেরেগুলকে অজানা অপরাধের শাস্তি পেতে হচ্ছে ? কি তার অপরাধ ?

এক পা দুপা করে এগিয়ে আসছে কুকুরটি। চোখ দুটোতে অসম্ভব হিংস্রতার ছাপ। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় শেরেগুল- কি করত পারে সে এখন ? সিংহের মত হা করে কুকুরটি এক লাফে এগিয়ে আসে তার দিকে বিকট শব্দে। এ্যক্রোবেটিক কায়দায় সরে পড়ে সে পলকে। কুকুরটি বিশাল বপু নিয়ে লোহার রডে ছিটকে পড়ে। জিহবা বড় করে হাঁফাতে থাকে। এবার আরো যেন হিংস্র হয়ে উঠে। আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ে এবার শেরেগুল বাঁচার তাগিদে কুকুরটির চোয়াল লক্ষ্য করে বিরাশী শিক্কার ল্যাপ্ট জ্যাক মারে জুডো কায়দায়। কুকুরটি কাউ কাউ করে উঠে ব্যথায়। যেন ক্ষিপ্র হয়ে উঠে মুহূর্তে। বাইরে থেকে অদ্ভূত এক শব্দ ভেসে আসতেই কুকুরটি রণে ভঙ্গ দেয়। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিঞ্জরার এক পাশে শুয়ে লোহার রড কামড়ে ধরে ব্যর্থতার গ্লানিতে।

শেরেগুলের পিছনে ওস্তাদ দাঁড়িয়ে। সা-বা-স শেরেগুল, সা-বা-স। তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। পিঠ চাপড়াতে থাকেন ওস্তাদ খুশি হয়ে। কিছু মনে করো না। এটা ছিল তোমার জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। তোমাকে মেরে ফেলার আদেশ কুকুরটিকে দেয়া হয়নি। শুধু তোমার সার্ট আর প্যান্ট ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার নির্দেশ ছিল। অবশ্য তাকে সে সুযোগ দেয়া হয়নি। চেয়ে দ্যাখো, লোহার রড কামড়ে কিভাবে তার রাগ প্রশমিত করছে ! জানো, আমাদের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ায় তাদের অনেকের রক্তের স্বাদ এ কুকুরটি নিয়েছে। তার সত্যিকার হিংস্র রূপ তুমি দেখোনি। নির্দেশ পেলে কি ভয়ঙ্করভাবে সে মানুষ নিয়ে খেলতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। ! এ ধরনের বাহাদুর আমাদের কাছে রয়েছে অনেক। পৃথিবীর প্রতিটি বড় বড় শহরে এদেরকে ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো হয়। অন্ধকার কক্ষে রাখা হয়। শুধু একটি নির্দেশ, ব্যাস। যারা আমাদের পথের কাঁটা- তাদেরকে ধরে এনে দলের লোক এদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পরের দিন কয়েকটি পরিত্যাক্ত হাঁড় ফেলে আসতে হয় ডাস্টবিনে।

আফজল খানের নের্তৃত্বে শেরেগুল প্রথম অ্যাসাইনম্যান্ট নিয়ে আফগানিস্তানের চমন বর্ডার দিয়ে পাকিস্তানের কোয়েটাতে প্রবেশ করে। পুরিন্দাগুলো মসজিদের দারোয়ান ছদ্মবেশী হেলাল খানের কাছে পৌঁছে দিয়ে আনুগত্যের নিদর্শনসরূপ পঞ্চাশ হাজার রুপাইয়ার কড়কড়ে নোটগুলো প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল তার অগ্রযাত্রা। টাকার ঘ্রাণ

www.pathagar.com

তাকে এক স্বপ্নিল নেশায় বিভোর করে দিয়েছিল। গত দশবছরে অনেক কামিয়েছে সে। কোটি কোটি টাকা। চাকরিক্ষেত্রে চারটি পদোন্নতি পেয়ে নিজের অবস্থানকে করেছে আরো সুদৃঢ়। পৃথিবী চষে বেড়িয়েছে। সাতটি মহাদেশের অগণিত রাজধানীতে পৌঁছে দিয়েছে নেশাখোরদের কাছে তাদের নেশার উপাদান। চাওয়ার শেষ নেই বলে ঢাকা ও জেদ্দার দশলক্ষ রুপেয়ার এবারের অফারটি সে পায়ে ঠেলে দিতে পারেনি। ভেবেছিল এ অফারের সম্পূর্ণ সে গুলবদনের জেওর কিনতে খরচ করবে। মায়ের পছন্দ করা শৈশবের খেলার সাথী গুলবদনকে আপাদমস্তক সোনা দিয়ে সাজিয়ে ঘরে তুলবে। গুলবদনের রূপের সাথে যদি কারোর তুলনা করতে হয় তাহলে হুরপরীর সাথেই তুলনা করতে হবে। মনে পড়ে স্কুলে তৈমুর লং নাটকে তার পাঠ দেখে গুলবদন বলেছিল- তুমি যদি সত্যিই তৈমুরের মত দুনিয়াটা জয় করে নিতে পারতে ? উত্তরে সে বলেছিল, পারবোনা কেন জানিস ? যেহেতু তৈমুরের মত আমার এক পা খোঁড়া নয় বলে। স্বপ্নিল সে দিনগুলোর কথা মনে হতেই ঠোঁটের কোণে হাসির লহর খেলে যায় মুহূর্তে।

শেষ অ্যাসাইনমেন্ট দুটো নিয়ে সে বেরিয়েছিল তিনমাস পূর্বে। কাবুল থেকে করাচী হয়ে ঢাকা। সর্বশেষ গন্তব্য জেদ্দা। ঢাকার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে রিসিভ করেছিল দলের সদস্য সলমান। কাস্টমস কাউন্টারের ভি. আই. পি চ্যানেল দিয়ে অতি সহজে পেরিয়ে এসেছিল সে। সলমানের সাথে ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম সারির একজন নামকরা ব্যবসায়ী। টাকার কুমীর। হোটেল সোনারগাঁয়ের নির্দিষ্ট কক্ষে সাজানো তিনকিলো ওজনের পুরিন্দাগুলো হ্যান্ডওভার করে এক স্বস্থির নিঃশ্বাস নেয় সে। পেমেন্ট যথাসময়ে পৌঁছে যাবে ঢাকাস্থ আমেরিকান একপ্রেস ব্যাংকের তাদের সেন্ট্রাল একাউন্টে। তার আগমন উপলক্ষ্যে হোটেল সোনারগাঁয়ে প্রিন্সেস লায়লা নাইটের আয়োজন করেছিল সলমান। বোম্বে হতে এসেছিল লায়লা। বাজনার তালে তালে শরীরের সুন্দর সকল ভাঁজগুলো ফোটানো ফুলের মত মেলে ধরেছিলো লায়লা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সমাজের উচ্চস্থানীয় অনেক নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে। সবাই তাদের খদ্দের। নেশার রাজ্যে সবাই এক একজন রাজা-রাণী। হোটেল বলরুমে ঢলে পড়েছিল নেশাগ্রস্ত নারীপুরুষের দল একসময় নিজেদের পছন্দনীয় একে অপরের মুক্ত আলিঙ্গনে। পূব-আকাশে ভোরের সোনালী সূর্যের রক্তিমাভা হোটেল কক্ষে উঁকিঝুঁকি দিতেই নেশা কাটিয়ে ওঠা অর্ধউলঙ্গ নরনারীর দল হোটেল সংলগ্ন সুইমিং পুলে নেমে পড়ে রাতের আবর্জনা ধুয়ে ফেলার লক্ষ্যে। সকাল দশটার দিকে কেউ কেউ ছুটে চলে রাজনৈতিক মঞ্চের সামনে অপেক্ষমান উল্লাসিত জনতার সামনে। কেউবা সিনেমার মুভী ক্যামেরার সামনে। আবার কেউবা অফিস বস হয়ে শত শত অধঃস্তন কর্মচরীর সামনে। দিনের আলোয় ওদের প্রত্যেকেই নেতৃত্ব দিচ্ছে এক বিরাট জনগোষ্ঠীর।

নিজেকে ওদের চেয়ে অনেক উত্তম মনে হয় শেরেগুলের। সাদা সাদা পাউডারের পুরিন্দা সে গত দশ বছরে অনেক পাচার করেছে, কিন্তু শরীরের ওপর এর প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেনি কখনো। ট্রেনিংয়ের সময় ডাঃ নিজাম-উল-মুলক, ল্যাবরেটরি কক্ষে দেখিয়েছিলেন এর প্রতিক্রিয়া। ডিস্টিল ওয়াটারের সাথে পাউডার মিশিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায়

www.pathagar.com

প্রস্তুতকৃত ইনজেকশনটি পুশ করেছিলেন একটি ইঁদুরকে। নেশায় বুদ হয়ে পড়েছিল ইঁদুরটি। দ্বিতীয়দিন সকাল আটটায় তার খাঁচায় চিক চিক শব্দ করছিল। ইনজেকশন পুনরায় পুশ করলে শান্ত হয়ে পড়ে রইল আবারো নেশার রাজ্যে। তৃতীয়দিন সকালে এক অভিনব কাণ্ড দেখতে হল শেরেগুলকে। ঠিক সকাল আটটায় ইঁদুরটি খাঁচায় লাফাচ্ছিল আর ভীষণ শব্দ করে যেন কাঁদছিল। ডাঃ মুলক সকল ট্রেইনিদেরকে এক ঘন্টা দেরিতে নিয়ে গেলেন খাঁচার সামনে। বললেন, ইনজেকশন পুশের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে বলে ইঁদুরটি এখন পাগলপ্রায়। তাকে তার প্রাপ্য দিতেই হবে বলে এগিয়ে গেলেন খাঁচার সামনে। আশ্চর্যভাবে ইঁদুরটি তারের ফাঁক দিয়ে দু-পা বাড়িয়ে দিল স্বেচ্ছায়। ইনজেকশনটি পুশ করতেই একেবারে চুপচাপ। নিবোর্ধ বালকের মত পিট পিট করে একবার তাকালো সবার দিকে। পরম আরামে চোখ বুঝল ঝড়ের শেষে ক্লান্ত পাখির ন্যায়। এবার পাউডারের প্রয়োগ দেখালেন ডাঃ মুলক অন্যভাবে। একটি পিতলের কৌটায় সামান্য পাউডার ঢেলে এগিয়ে গেলেন খাঁচায় রক্ষিত শিম্পাঞ্জীর দিকে। পকেট থেকে লাইটার বের করে পাউডারে একটু আগুন ধরিয়ে দিলেন। সিম্পাঞ্জী পাগলের মত ছুটে এসে নাক দিয়ে দু-তিন টান দিয়ে নির্গত ধুঁয়া সেবন করে চোখ বুজে বুদ হয়ে পড়ে রইল পরম স্বপ্ন রাজ্যে। ডাঃ মুলক বললেন, এগুলো এমন জিনিষ যা মাত্র তিনদিন ব্যবহার করলে বাকি জীবন ব্যবহার করতেই হবে। আমাদের খদ্দের এ পৃথিবী জুড়ে অনেক। ব্যর্থ প্রেমিক, বড়লোকের অবাধ্য সন্তান, দাম্পত্যজীবনে অসুখী দম্পতি, প্রতিষ্ঠালোভী রাজনীতিবিদ, আরো রয়েছে সমাজে প্রতিষ্ঠিত অনেক টাকার কুমীর। ওদের বিরুদ্ধে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কিছুই করতে পারে না। করতে গেলে ওদেরকে হয়তো হারাতে হবে চাকরি নতুবা জীবন। তাছাড়া আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাফিয়ারা তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। বিশ্বজুড়ে আমাদের প্রচণ্ড প্রতাপ। কথাটি সত্য কিন্তু এ সত্যটি কেন প্রমাণিত হচ্ছে না এ মরু শহরে ? তিনটি মাস ধরে কারাগারে সে অন্ধকার সেল প্রকোষ্ঠে বন্দী। অথচ এখানকার কমান্ডোদের যেন কোন মাথাব্যথা নেই ? তাহলে কি তাকে এরূপ বিপদে ফেলা হয়েছিল দলের কোন ক্ষমতাধারী ব্যক্তির ইচ্ছায় ? তা-ই বা হয় কেমন করে ? তাদের অভিধানে ব্যক্তিগত স্বার্থে দলের লোককে ইচ্ছে করে বিপদে ফেলার কোন রীতি নেই।

মনে পড়ে- ঢাকাস্থ হোটেল সোনারগাঁয়ের বিশ নম্বর কক্ষে সলমান-এর সাথে এক ভদ্রলোক ঢুকেন। সলমান পরিচয় করিয়ে দেয় ইনি হচ্ছেন আমাদের বিশ্বস্ত ফ্রেন্ড। কাস্টমস ইনটেলিজেন্সের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ব্রিফকেসটি যথাসময়ে তোমার হাতে পৌঁছবে ইমিগ্রেশন অতিক্রম করার পর। শুধু তোমার পাসপোর্টটি তোমার কাছে থাকবে। সলমান একটি খাম এগিয়ে দেয় শেরেগুলের দিকে। স্মিতহাস্যে বলে, বাদবাকি যা করার তা এতেই লিখা আছে। কোড নম্বরগুলো মিলিয়ে নিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

নীল স্যুট পরিহিত শেরেগুলকে ভীষণ হ্যান্ডসাম লাগছিল। সলমান রসিকতা করে বলে, মেয়েরা তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে তাই ভাবছি ! সাথের ভদ্রলোক সলমানের কথায় খেই ধরে বলেন, সত্যিইতো এমন হ্যান্ডসাম মানুষ

www.pathagar.com

সচরাচর দেখা যায় না। আপনাদের সিলেকশনের প্রশংসা করতেই হয়।

সকাল এগারোটায় জেদ্দাগামী বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ডি.সি টেন-এ চড়ে বসে শেরেগুল। প্লেনে উঠার পূর্বমুহূর্তে কাস্টমস ইনটেলিজেন্সের সে অফিসার একরকম দৌড়ে এসে যাত্রীদের সামনে শেরেগুলকে ইংরেজিতে বলেন, আপনার ব্রিফকেসটি ভুলে ফেলে এসেছেন। এই নিন, গুড লাক বলে করমর্দন করলেন। যাত্রীদের অনেকেই অফিসারটির সততার প্রশংসা করল।

আনন্দ-বিষাদে মাখানো অনুভূতির ছন্দপতন ঘটল জেদ্দা বিমানবন্দরে নিরাপদ অবতরণের মধ্য দিয়ে। ইমিগ্রেশন পেরিয়ে কাস্টমস কাউন্টারের ঠিক বিপরীতে একটি চেয়ারে বসে সতর্কতার সাথে স্যামসনেট ব্রিফকেসটি খুলে শেরেগুল। তিনটি নীল প্লাস্টিকের কৌটা ব্যগের উপরে সাজিয়ে রাখে সে। একটির উপরে রয়েছে সাজানো শুকনো রুটি, অন্য দুটির ভিতর অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের উপর সাজানো রয়েছে খেজুর সুন্দরভাবে। এক টুকরো রুটি মুখে পুরে শেরেগুল চিবুতে থাকে। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, নির্দিষ্ট লোকটি আসছে না কেন ? কাস্টমস কর্তৃপক্ষের একজন সামনে এগিয়ে এসে শেরেগুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে- ইয়াল্লাহ- সুরা ইয়া শেখ .. .. তাড়াতাড়ি শেষ করে কাস্টমস কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করে। রুটি চিবুনের মধ্য দিয়ে একটু সবুরের মিনতি জানায় শেরেগুল।

শাসরুদ্ধ পরিস্থিতির অবসান ঘটল যখন হলুদ পোশাক পরিহিত এয়ারপোর্ট ক্লিনার জাওয়েদ এসে সামনে ঝাড়ু দেয়ার ভান করছিল। হ্যাঁ, স্পষ্টই বুক পকেটের উপর জাওয়েদ নামটি লিখা দেখে আশ্বস্ত হয় শেরেগুল। চোখাচোখি হতেই দুজনের ভাবের আদান-প্রদান হয় নীরবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে শেরেগুল আস্তে করে তিনটি কৌটাই জাওয়েদের কালো পলিথিন গার্বেজ ব্যাগে ছুঁড়ে দেয় পলকে। শেরেগুলকে ইশারায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে কাজে মন দেয় ক্লিনার জাওয়েদ।

নিজেকে হালকা মনে হয় শেরেগুলের। সবকিছুই নির্দিষ্ট গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, কোথাও কোন খুঁত নেই। কাস্টমস কাউন্টার পেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে গুণ গুণ করে গান ধরতেই সামনে এসে দাঁড়ায় একটি লোক। উঁচু করা প্লেকার্ডে এস, জি, খান- গেস্ট অব হলিডে ইন লিখা দেখেই ইশারা করে শেরেগুল। লোকটির পিছনে পিছনে সন্তর্পণে এগিয়ে যায় অপেক্ষমান ট্যাক্সির দিকে।

ট্যাক্সিতে বসে শেরেগুল তার প্রিয় হাভানা ফিল্টার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দেওয়া মাত্রই জাওয়েদ এসে তার পায়ের কাছে কালো পলিথিন ব্যগটি রেখে ফিস ফিস করে বলল, ওয়েল ডান। গুড লাক। সি ইউ এগেন। মুহূর্তে নিষ্ক্রান্ত হল জাওয়েদ। ট্যাক্সির বনেট খুলে এতক্ষণ ড্রাইভার ইঞ্জিন পরীক্ষা করছিল। জাওয়েদের কাজ শেষ হওয়া মাত্রই নিমিষে ট্যাক্সির বনেট লাগিয়ে ড্রাইভিং সিটে ফিরে এসে এক্সিলেটরে পা দাবালো। বাতাসের বুক চিরে টয়োটা ক্রেসিডা যেন হাওয়ার উপর ভর করে চলল নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

একদৃষ্টে চেয়ে আছে শেরেগুল গাড়ির জানালা পথে উদাস নয়নে। রাতের আকাশে

www.pathagar.com

অযুত নক্ষত্র আর রাস্তার দুপাশের উজ্জ্বল আলোর শোভা। মরুর বুকে এ ধরনের একটি সুন্দর শহরের সাথে শেরেগুলের পরিচয় এই প্রথমবারের মত। ফ্লাইওভারগুলো আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার অনুরূপ। মদিনা রোড ধরে ডাউন টাউনের দিকে এগিয়ে চলছে ওরা। ডান দিকের ভিউ গ্লাসের দিকে নজর পড়তেই শেরেগুল ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলে, টিকটিকি তোমার পিছনে লেগেছে, দেখতে পাচ্ছ না?

হচকিয়ে উঠে ড্রাইভার। ব্যাক ভিউ গ্লাসে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

ওস্তাদ তোমার আন্দাজ সত্য হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায় !

পেপসি ওভারব্রিজের পাশে এসে ড্রাইভার ইচ্ছা করেই ডানদিকে মোড় নেয়। তাহলিয়া রোড ধরে সাগর অভিমুখে ছুটে চলে হাওয়ায় ভর করে। আধাকিলোমিটার দুরত্ব বজায় রেখে পুলিশের ৯৯৯নং গাড়িখানা পিছু ধাওয়া করে। তাহলিয়া রোডের শেষ প্রান্তে এসে আবার তাদের গাড়িটি বায়ে মোড় নেয়। পুলিশ ভ্যানটি ঠিক আধাকিলোমিটার দুরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে আসছে। এবার ড্রাইভার নিশ্চিত হয়ে বলে, ওস্তাদ! তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে অসুবিধা নেই, এ যাবত ওরা আমাকে কত দেখিয়েছে আর আমিও ওদেরকে কত দেখিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। এবার দেখবে ঠিক ওদের সম্মুখ দিয়েই পার হব ! দশর-বারোবার ডানে বামে ঘুরপাক খেয়ে পুনরায়ঃ মদিনা রোডের দিকে এগিয়ে চলে তাদের ক্রেসিডা।

রাস্তায় পুলিশ ভ্যানটিকে ক্রস করতেই পুলিশ ইশারা করে গাড়ি থামানোর জন্য। গাড়ি থামালে পুলিশ এগিয়ে এসে আরবিতে শুধায়, কোথায় যাচ্ছ ? ড্রাইভার বলে- এয়ারপোর্টে। শেরেগুলের দিকে একনজর দেখে পুলিশ সত্যতা যাচাই করে। বলে তোমরা কি এই কিছুক্ষণ আগে একটি সাদা ক্রেসিডাকে এ রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে দেখেছ ? কত গাড়িইতো দেখেছি তবে ঠিক পাঁচমিনিট পূর্বে একটি ক্রেসিডাকে পাশ দিয়েছি যা সাগর অভিমুখে যাচ্ছিল। নির্লিপ্ত উত্তর ড্রাইভারের। কোন কথা না বলে পুলিশ এবার সাথীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ইয়াল্লাহ রু সুরাহ গো কুইকলি .. বলেই ত্রস্তপদে পুলিশটি নিজের সিটে চেপে বসে।

শেরেগুল ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলে, সত্যি তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়! হাসিভরা মুখে ড্রাইভার এবার বলে, ওরা এতক্ষণে হয়তো সাগরপানে ছুটে চলছে। মাত্র এককিলোমিটার দূরে লোহিত সাগর। সাগরের মৃদুমন্দ বাতাসে তাদের ক্লান্তি জুড়াবে, ভালো করিনি ওস্তাদ ? হো, হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ড্রাইভার।

হলিডে ইন-এর পনেরো নম্বর কক্ষে বসে সকাল দশটায় অপেক্ষা করছিল শেরেগুল ড্রাইভারের জন্যে। ম্যাপটি চোখের সামনে মেলে ধরে: ক্যাফেটারিয়া আফগানী- বাবমক্কা ফার্মেসির পাশ দিয়ে সরু গলিতে বিশহাত এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে। ফার্মেসির কাছে গেলেই সে ম্যাপ অনুযায়ী খুঁজে নিতে পারবে।

ওয়াল ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে‌ওঠে সে। দশটার স্থলে এগারোটা! তবে কি ড্রাইভার কোন বিপদের সম্মুখীন হলো ?

আকস্মাৎ কড়া নাড়ার শব্দ হতেই হকচকিয়ে ওঠে শেরেগুল। নিরাপদ জায়গায় প্যাকেটগুলো রেখে দরজার কাছে এসে বলে, কে ? উত্তর আসে, ওমরার ড্রেসে মালগুলো নিয়ে সাবধানে নেমে এসো ওস্তাদ। হোটেল রেইড করছে পুলিশ। সাবধান.. ..।

গতরাতে কেনা ওমরাহের ড্রেস পরে নেয় শেরেগুল অতি দ্রুত। তিনটি কৌটা প্লাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে দুটো উরুর সাথে বেঁধে নেয় সতর্কতার সাথে। দোতালা বেয়ে নামতেই দেখা

www.pathagar.com

হয় মিশরীয় এক পরিবারের সাথে। ওদের সাথে বছরদুয়েক ব্যবধানের তিনটি বাচ্চাও রয়েছে। ভদ্রলোকের পরণেও ওমরাহের ড্রেস। নিশ্চয় ওরা ওমরাহ্ করতে যাচ্ছে। বাচ্চা তিনটি এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে। শেরেগুল সব চেয়ে ছোটটিকে কোলে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলে- প্লিজ প্রসিড, আই উড লাইক টু হেল্প ইউ। ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে শুধান, আর ইউ গোয়িং ফর ওমরাহ ? ইয়েস, ফর দি ফার্স্ট টাইম। শেরেগুলের কোলে ছেলেটি লাফাচ্ছে মুক্তি কামনায়।

রিসিপশনে নেমেই তিনজন পুলিশের মুখোমুখি হতে হয় তাদেরকে। ফিস ফিস করে একজন পুলিশ অপরজনকে বলে- হুম্মা মিশরীন, খাল্লিনা রুহ্। মিশরীয় ভদ্রলোক দণ্ডায়মান পুলিশকে সালাম দিতেই একজন পুলিশ বলে ওঠে ইয়া আহলান ওয়া সাহলান- ইনশাআল্লাহ ওমরাহ মবরুক। শেরেগুল এমন ভাব দেখালো যে, বাচ্চাটিকে নিয়ে সে মস্ত বে-কায়দায় পড়েছে। অন্যদিকে তাকানোর ফুরসৎ তার নেই। পুলিশ ওদেরকে একই ফ্যামিলির বলে ধরে নিয়েছে নিশ্চয়ই।

গেট পেরিয়ে শেরেগুল ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে, ওরা আপনাকে কি বলছিল, ঠিক বুঝতে পারিনি।

আর বলবেন না। এদেশের আইনকানুনের কিছুই বুঝি না। বে-আইনী লোক খুঁজছো, ভালো কথা, তবে হোটেলে কেন ? হোটেলে কর্তৃপক্ষ রেজিস্টার মেনটেইন করে। বলুনতো বে-আইনী লোককে হোটেল কক্ষ কর্তৃপক্ষ কি ভাড়া দেবে ? কোনদিন যে ওদের মাথায় ঘিলু হবে তা আল্লাই ভালো জানেন ! বলে কি - ওরা মিশরীয়, ওদেরকে যেতে দাও। এমনভাবে বলল যে, আমরা সবাই শুনতে পেলাম- হো হো করে হেসে উঠেন ভদ্রলোক।

মিশরীয় ভদ্রলোকের কাছ হতে বিদায় নিয়ে পার্কিংয়ের দিকে এগিয়ে যায় শেরেগুল। একটি কালো রংয়ের পাজারো গাড়িতে ড্রাইভারকে উপবিষ্ট দেখে সেটাতেই ওঠে বসে সে।

টয়োটার কি হল? পরিবর্তে পাজারো !

এর কারণও কি বুঝিয়ে বলতে হবে ওস্তাদ? গতরাতের টিকটিকিরা কি এত সহজে টয়োটা ক্রেসিডাকে ভুলতে পারবে ? আচ্ছা, মালগুলো নিয়ে আসতে কোন অসুবিধা হয়নিতো?

না।

এখন কোথায় যেতে হবে ওস্তাদ ? পশতু ভাষায় প্রশ্ন করে ড্রাইভার।

বাবমক্কা ফার্মেসি।

ফার্মেসির সামনে শেরেগুলকে নামিয়ে দিয়ে একটু দূরে নিরাপদ অবস্থানে অপেক্ষা করতে থাকে ড্রাইভার। তার উপর যতটুকু দায়িত্ব ঠিক ততটুকুই করতে হবে। অহেতুক প্রশ্ন বা কথা তাদের মানা।

ফার্মেসির পাশ দিয়ে সরু রাস্তা ধরে কিছু এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ে ক্যাফেটারিয়া আফগানী। লম্বা দাড়িওয়ালা আফগানী লোকটি ঘামে একাকার হয়ে রুটি বানাচ্ছে। পাশে বেশ কিছুসংখ্যক খরিদ্দার। কে আগে রুটি নিবে তা নিয়ে দু-একজনের মধ্যে কথা কাটাকাটিও চলছে।

ভিড় একটু পাতলা হতেই শেরেগুল এগিয়ে এসে পশতু ফার্সির সংমিশ্রণে শুধায়, বেহান্দ জোরমে দাস্তান ?

শেরেগুলের আপাদমস্তক দেখে লোকটি মুচকী হেসে নিচের দিকে চেয়ে আস্তে করে উত্তর দেয়, বেহান্দ দাজা দস্তি।

www.pathagar.com

উত্তরে নিশ্চিত হয়ে শেরেগুল নীল প্লাস্টিকের কৌটাটি সর্তকতার সাথে এগিয়ে দেয় আফগানীকে, পরিবর্তে একটি রুটি হাতে নিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে যায় অপেক্ষমান গাড়িটির দিকে।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। পার্শবর্তী হোটেল এশিয়াতে লাঞ্চের জন্য ঢুকে পড়ে শেরেগুল ড্রাইভারকে নিয়ে। চব্বিশ ঘন্টার জন্য একটি রুম ভাড়া নেয়। আর মাত্র দুটো প্যাকেট বাকি।

ট্যাক্সি এবার ছুটে চলে বনিমালিকের উদ্দেশ্যে শেরেগুলের নির্দেশে ঠিক পাঁচ ঘন্টা পর। বনিমালিক পৌঁছেই দেখে পাকিস্তানী লোকজনদের অহরহ বিচরণ। কে বলবে এটা সৌদিআরব ! যেন সারা পাকিস্তানের তাবত লোকজন চলে এসেছে এখানে। আল রাজি ব্যাংককে পিছনে রেখে সামনের দিকে তাকাতেই ছোট্ট পানবিড়ির দোকান তার নজর এড়ায় না। দোকানের সামনে ঠোঁট ও দাঁত লাল করা খরিদ্দারদের অসম্ভব ভীড়। মাগরিবের আজানের সাথে সাথেই ভীড় একটু কমে গেল। সেই সুযোগে শেরেগুল এগিয়ে যায় দোকানির সামনে। লোকটিকে পাঠানী বলে মনে হচ্ছে। বর্ণনানুযায়ী বসন্তের কালো দাগগুলো গালজুড়ে রয়েছে। তবুও নিশ্চিন্ত হতে হবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরখ করে দোকানি শেরেগুলকে। খাঁটি উর্দুতে আহ্বান জানায়, আইয়ে আইয়ে ছাহাব, পান চাহিয়ে?

আফগানকা সফেদ জর্দা হায় ? শেরেগুলের কৌতুহলী দৃষ্টি ।

কিয়া ? কিয়া বলা ? আফগানকা সফেদ জর্দা ? ইয়েতো নেহী হ্যায় লেকিন চমন কা চমনবাহার হ্যায়। উস জর্দা-কা লিয়ে বহুত কাস্টমার ইনতেজারমে হ্যায়।

চমনবাহার ! ইনতেজার ! সঠিক উত্তর। বিনা বাক্য ব্যয়ে দোকানির সামনে প্যাকেটটি রাখতে রাখতে শেরেগুল বলে - ইয়ে প্যাকেট আপকো পাস রাখ দিজিয়ে। ম্যায় বাদ মে লে যাউঙ্গা। আভি নামাজকা টাইম হ্যায়।

শেরেগুলের হাতে এক খিলি পান গুজে দোকানি সালাম জানায়। খুশিতে চিকচিক করে উঠে তার চোখ দুটো।

গালে পান পুরে বিজয়োল্লাস নিয়ে অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে ওঠতেই দুজন পুলিশ এসে ট্যাক্সির পথরোধ করে দাঁড়ায়। জানালার পাশে এসে শেরেগুলের দিকে চেয়ে পুলিশের একজন বলে, একামা ফি ?

শেরেগুল না বুঝার ভান করতেই পুলিশ বলে, একামা ফি - রেসিডেন্ট কার্ড?

শেরেগুল একথা জেনে এসেছে এদেশের আরবি জানা সাধারণ পুলিশদের ইংরেজিকে বড় ভয়। তাই এদেশে আমেরিকান, বৃটিশ বা ইউরোপের সাদা চামড়ার লোকদেরকে ওরা একটু সমীহের চোখে দেখে।

ওমরাহ ভিসা লাগানো পাসপোর্ট পুলিশের সামনে মেলে ধরে খাঁটি ইংরেজ স্টাইলে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে ওঠে, ডু ইউ ওয়ান্ট এনিথিং মোর, স্যার ? সাহেবসুলভ শেরেগুলের চেহারার দিকে চেয়ে পুলিশ উত্তরে ও,কে .. ও,কে, ইয়াল্লাহ রুহ - বলে ইশারায় চলে যেতে বলে।

শেষ প্যাকেটটি বাজার সংলগ্ন মসজিদের পাশে মুচী ছদ্মবেশী আফগানী আল্লারাক্ষা খানের কাছে পৌছে দিতে গিয়েই হল যত সমস্যা। পাশের চা স্টল হতে আকস্মিক ঝড়ের বেগে সাদা পোশাক পরিহিত নিরাপত্তা পুলিশ বাহিনীর তিনজন তাদের দুজনকে ঘেরাও দিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে যখন বলল, ডোন্ট মুভ, তখন তারা দুজনই থ বনে যায়। আল্লারাক্ষা খানের হাত থেকে পুলিশ প্যাকটটি উদ্ধার করে মসজিদের পাশে অপেক্ষমান ছোট্ট আকৃতির জীপের পিছনে দুজনকেই ওঠার নির্দেশ দেয়।

www.pathagar.com

পুলিশ ভ্যানে উঠতেই শেরেগুলের চোখ ছানাবড়া ! এয়ারপোর্টে যে কাস্টমস অফিসার রুটি খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি কাউন্টারে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, সে লোকটি বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল, কি বাছা ! ভেবেছিলে ওরা বেদুঈন। মগজে আর কিইবা আছে ? কিন্তু বাছা, বিমানের প্রথম শ্রেণীর এত খাবার দাবারের পর যখন শুকনো রুটি চিবুচ্ছিলে তখনই ভেবেছিলাম মতলব তোমার অন্যকিছু . তবে একটু দেরি করে ফেলেছি এই যা। আমাদের সিকিউরিটি তোমার পিছনে ধাওয়া করে তোমাকে হারিয়ে ফেলায় দিনরাত আমাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজতে হয়েছে। তোমার সাঙ্গপাঙ্গ টের পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে, তবে যাবে কোথায় ? তাদেরকেও তোমার মত ধরা পড়তেই হবে।

নিরাপত্তা প্রহরীর লোকজন আকস্মিক ভাবে সেলের দরজা খুলতেই তন্ময়তা কেটে যায় শেরেগুলের। স্টারধারী পুলিশ অফিসার তার দিকে ঝুঁকে নম্রভাবে প্রশ্ন করে, তোমার পছন্দ অনুযায়ী কিছু খেতে ইচ্ছে হয় বা কাউকে কিছু বলার আছে ? সম্ভব হলে আমরা তা রক্ষা করব। উত্তরের অপেক্ষায় একদৃষ্টে পুলিশ অফিসার শেরেগুলের মুখপানে চেয়ে থাকে।

শেরেগুল বুঝতে পারে এই সাতসকালে পুলিশ অফিসারের এহেন আচরণ কোন এক মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত।

বুকে সাহস এনে উল্টা প্রশ্ন করে, কখন আমাকে মুক্তি দিচ্ছ তোমাদের এই নরক থেকে ? তিনমাসতো রাখলে, আর কত ? এই সাতসকালে ভালয় ভালয় ছেড়ে দাও। কেটে পড়ব। কথা দিচ্ছি, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। নতুবা আমাকে কষ্ট দেয়ার অপরাধে তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। আমাদের ক্ষমতা সম্মন্ধে নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে৷

পুলিশ অফিসারের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে ওঠে, রাগ দমন করে শান্তভাবে বলে, দ্যাখো, বয়সে কিন্তু আমি তোমার বড় হব। তাছাড়া আজ শুক্রবার। বরকতের দিন। জুমার নামাজান্তে তোমার এবং আমাদের মধ্যে চিরদিনের মত সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। তুমি আর যাই কর না কেন একজন মুসলমানতো বটে। সুতরাং ভালো একটা কিছু চাওয়ার থাকে তো বল ? তোমার সাথী আল্লারাক্ষা খান কিন্তু আমাদের কাছে ওমরাহ করার অনুরোধ জানিয়েছে এবং তা রক্ষার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

ওমরাহ-র কথা শুনে শেরেগুলের মনে পড়ে যায় মায়ের শেষ কথা। হ্যাঁ-রে শেরেগুল, সৌদিতে যখন যাচ্ছিস তাহলে অবশ্যই ওমরাহ করে আসবি বাবা। এত কম বয়সে আল্লাহ তোকে এতকিছু দিয়েছেন তারজন্য শোকর গোজারী করবিনা ?

হ্যাঁ - তাই করতে হবে। যে মাকে নিয়ে তার গর্বের অন্ত নেই, সে কল্যাণময়ী মায়ের শেষ উপদেশ। তাছাড়া দলের লোকজনেরা নিশ্চয়ই ওঁৎ পেতে আছে। জেলের বাইরে বেরুতে পারলে নিশ্চয়ই ওরা সুযোগ হাতছাড়া করবে না। উৎসুক ভঙ্গিতে শেরেগুল মিনতি জানায়। যদি ওমরাহ করার সুযোগ দাও তাহলে বিশেষ করে তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব যেহেতু এটাই ছিল এখানে আসার সময় আমার মায়ের শেষ উপদেশ।

ঠিক আছে। সময় যখন আমাদের হাতে পাঁচছয় ঘন্টা আছে তখন তোমাদের দুজনের অনুরোধ রক্ষা করা হবে, তবে এ ধরনের অনুরোধ রক্ষা এই প্রথম।

প্রহরাবেষ্টিত পুলিশের জি, এম, সি গাড়িতে ওমরাহ করে ফিরে আসতে প্রায় চারঘন্টা লেগে যায়। ওমরাহ করার পর শেরেগুল অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে যায়। এক অপূর্ব প্রশান্তিতে মন যেন ভরে উঠেছে কানায় কানায়। ত্রিশ বছরের এ জীবনে ধনদৌলত, আরাম আয়েশ তার পায়ে লুটোপুটি খেয়েছে, কিন্তু এমন স্বর্গসুখ জীবনে কখনো সে অনুভব করেনি। ইচ্ছা হয় সারাটি জীবন এমনিভাবে পবিত্র কাবার সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেয়। দুচোখ ভরে জল আসে

www.pathagar.com

শেরেগুলের।

জেদ্দায় ফেরার পথে ভাগ্যিস রাস্তায় কোন কমান্ডো আক্রমণ হয়নি। তাহলে ওরা কি সবাই ধরা পড়েছে ? ওদের যা হয় হোক। শেরেগুল আর ভাবতে চায় না ওদের কথা। জীবনের চোরাগলিতে হাঁটতে গিয়ে সে যা হারিয়েছে তা এক অব্যক্ত বেদনায় ডুকরে কেঁদে ওঠে এ মুহূর্তে।

সূর্য তখন মধ্যাকাশে। জুমার নামাজের আজান প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দিকে দিকে। আটজন সদস্যের স্পেশাল পুলিশ ইউনিট শেরেগুল ও আল্লারাক্ষা খানকে পুলিশ ভ্যানে উঠায়, দুচোখ বেঁধে দেয়। গাড়ি এগিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে। পথিমধ্যে বিশেষ পোশাক পরিহিত, কটিবন্ধে ক্ষুরধার তরবারীতে সুসজ্জিত জল্লাদদ্বয় পুলিশ ভ্যানে উঠে। কোন কথা নেই কারোর মুখে। গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে কোর্ট প্রাঙ্গণে, যার নির্দিষ্ট স্থানে অসংখ্য জনতার সামনে এদেশীয় আইনে সুষ্ঠু বিচার হবে। মুয়াজ্জিনের সুললিত কণ্ঠে আজানধ্বনি শেষ হয়ে আসছে..

হাইয়া আলাস্ সা.. লা.. হ..

হাইয়া আলাল্ ফা.. লা.. হ..

নামাজের জন্য আসো, কল্যাণের জন্য আসো .. ..।

শেরেগুলের দুচোখ জুড়ে প্রবল ঘুম আসছে। এত প্রগাঢ় ঘুমের আমেজ জীবনে তার এই প্রথম ? মায়ের পবিত্র মুখখানা ভেসে উঠে মনের আয়নায়। মা এবং গুলবদনকে কথা দিয়ে এসেছিল, ফিরে আসা মাত্রই ঘটা করে বিয়ে হবে। গুলবদন হয়তো সে প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। সেই শৈশব হতে যাকে ঘিরে তার স্বপ্ন দোল খাচ্ছে, তার মুখচ্ছবি যেন দূর হতে আবছা অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। গুলবদনের গোলাপী উড়না তন্দ্রাচ্ছন্ন শেরেগুলের দুচোখটি যেন পেঁচিয়ে রয়েছে। অবশ শরীরের সাথে তাল মিলিয়ে শিরটি দুলতে থাকে গাড়ির ঝাঁকুনিতে। অস্পষ্ট ভাষায় বলে উঠে, হে আল্লাহ্! তুমিই এ বিশ্বের প্রভু, জগতের সমগ্র কল্যাণ তোমারই আয়ত্বে। কল্যাণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমার মত একজন গুনাহগারকে সরিয়ে নেয়া-ই উত্তম।

* * *

www.pathagar.com

দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন

আজ স্রেফ আপকা চিট্রি আয়া ছোট সাহাব ! পেপসি পিলাও।- হাসতে হাসতে ইন্ডিয়ান অফিসবয় ইকবাল চিঠিখানা এগিয়ে দেয় সাদেকের হাতে।

একরকম ছোঁ মেরে বিনা বাক্যব্যয়ে ইকাবালের হাত থেকে চিঠিখানা কেড়ে নেয় সাদেক। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত চিঠি। গত একমাসে অনিদ্রায় চোখের কোণে কালি পড়েছে। কপালে দেখা দিয়েছে বলিরেখা। একরাশ ক্লান্তির পাহাড় যেন তার বয়সকে বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বিগুণ।

এক প্রবল ঝড় এসে জীবনকে যে এভাবে তছনছ করে দেবে তা ভাবতেই পারনি সাদেক। গত একমাস যাবত বন্ধুবান্ধব থেকে সে বিচ্ছিন্ন। বাসায় পরিচিত ফোন এলে স্বর পাল্টিয়ে সংক্ষেপে বলে. রং নম্বর। একই ব্যক্তির ফোন আসে আবার। বাজতে বাজতে একসময় থেমে যায়।

আবেগ কম্পিত হস্তে চিঠির ভাঁজ খুলতে যাবে এমন সময় ফোন বেজে উঠতেই রিসিভার উঠায় সাদেক। ওপাশ হতে কচিকণ্ঠে শব্দ ভেসে আসে, বাপ্পী আমি বাঁধন। কখন আসছ ? আমার যে জ্বরে মাথা ফেটে যাচ্ছে। মামণিকে তায়েফ হতে কখন নিয়ে আসবে বাপ্পী ? মামণি আসছেনা কেন ?

তোমার কি খুব খারাপ লাগছে মা ? এইতো অফিস শেষ করেই চলে আসব। একটু সবুর কর মামণি ? আর শুনো, যদি খুব বেশি মাথা ধরে তাহলে তোমার পাশের টেবিলে রাখা প্যানাডল ট্যাবলেট একটি খেয়ে নেবে, কেমন? লক্ষী মা আমার। আসার সময় তোমার জন্য একগাদা পুতুল নিয়ে আসব। সেই যে দুধ না দিলে যে পুতুলটি কাঁদে সে পুতুলটিসহ, ঠিক আছে ? রাখি এখন, লাইন কেটে দেয় সাদেক।

মেয়েটির ভীষণ জ্বর আজ দশদিনের উপরে। ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ এনেছিল। পাঁচদিন পর পুনরায় যাওয়ার কথা। কিন্তু যাওয়া আর হয়নি। আজই ডাক্তারের কাছে বাঁধনকে নিয়ে যাবে মনস্থ করে পুনরায় চিঠিখানা চোখের সামনে মেলে ধরে সাদেক।

সাদেক, তোমার আমার মাঝে যে দেয়াল সৃষ্টি হল তারজন্য দায়ি হয়তো তুমি অথবা আমি কিংবা আমাদের ভাগ্য। সেদিন তুমি অফিসে যাওয়ার পর তোমার বন্ধু বলল, এক্ষুণি আমাকে তায়েফ যেতে হবে। মাত্র একদিনের ছুটি। চাকরি রক্ষা করতে হবেতো ?

আমি বললাম, আমাকে কি করতে হবে ?

মেয়েদের ঠিকানা তার স্বামীর ঘরে। সুতরাং কি করতে হবে না হবে তা তোমাকেই ঠিক করতে হবে রীতা। তাছাড়া ও মুহূর্তে আমি অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। তায়েফে গিয়ে ভেবেচিন্তে সঠিক সিদ্ধান্ত সাদেককে জানাব।

ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সত্যিকার অর্থে সেই তো আমার বর্তমান স্বামী। তার আদেশ শিরোধার্য। বাঁধনকে বুঝিয়ে রেখে এসেছিলাম ঘরে। জানিনা সে তোমাকে ফোন করেছিল কি না ?

www.pathagar.com

তোমার বন্ধুটিকে ক্রমশ জানতে পেরেছি অনেক। সে এক ভিন্ন পুরুষ, ভিন্ন ধাঁচের। সহজ, সরল কিন্তু শক্ত।

এখানে আসার পর সে আমাকে একদিন বলল, দ্যাখো রীতা, তোমাকে একটা কথা বলা প্রয়োজন। মানুষ ভুলকে যখন শুধরে নেয়ার চেষ্টা করে তাতে ভুলের পরিমাণই বাড়ে। জীবন হয় আরো দুর্বিসহ। সাদেক যখন ফোনে তার মনোবাসনা ব্যক্ত করল তখন বন্ধু হিসেবে এগিয়ে গিয়েছিলাম এই ভেবে যে, আমার মত সংসারবিমুখ ছন্নছাড়া এক মানুষ যদি তোমাদের উপকারে আসে তাহলে অসুবিধাটা কোথায় ? ধর্মের বিধান মোতাবেক সংশোধন করে তিনমাস পর আনুষ্ঠানিকভাবে সাদেক তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে পুনরায় গ্রহণ করবে। ওর এই দুঃসময়ে আমি পিছিয়ে থাকতে পারিনি। সাদেক ও আমি পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসাথে পড়েছি যদিও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে আমাকে ইতি টানতে হয়েছিল পারিবারিক প্রয়োজনে। ভার্সিটির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সাদেক এগিয়ে গেলেও আমাদের বন্ধুত্বে কিন্তু ভাটা পড়েনি। সে যাক, তোমার সাথে বিয়ে হল গোপনে দু'জন সাক্ষীকে সাক্ষ্য রেখে। সাদেকের পাশ দিয়ে বধূবেশে নির্ধারিত ঘরে ঢুকেই তুমি শুয়ে রইলে অসাড় হয়ে। অনেক রাত অবধি জেগে রইলাম আমি। ঘুম আসছিল না চোখে। একসময় তোমার পাশে শুয়ে পড়লাম। ঘুমের ঘোরে তোমারই ঋজুস্পর্শে আমার হৃদয়ের সমস্ত শাখা প্রশাখা পল্লবিত হল। আমি বিভোর হয়ে গেলাম পৈচাশিক এক উম্মাদনায়। জীবনে এই প্রথমবারের মত শতদল মেলে হৃদয়ে প্রেমের মুকুল প্রস্ফুটিত হল। আমার সারাজীবনের কুমারত্বের স্বপ্ন কোথায় বিলীন হয়ে গেল। অন্ধকার রাতের এই মোহনীয় পরিবেশে মনে হল আমার জীবনে যেন আর প্রভাত না আসে। কিন্তু এসময় প্রভাত হল। ঘুম ভাঙ্গল। দেখলাম, আমার পদযুগল তোমাকে বেষ্টন করে আছে। ঘুমের ঘোরে তুমি আমাকে আঁকড়ে আছ নিবিড় বন্ধনে। আমি বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম তোমার মুখের পানে। বিধাতার এক অনবদ্য সৃষ্টি আমারই বাহুতে বন্দিনী। সাদেকের কথা মনে হতেই আমার সমস্ত শিরা উপশিরা শিথিল হয়ে এল। এ আমি কি করছি ? আমার বন্ধু অন্য রুমে প্রভাতের প্রতীক্ষায় অনিদ্রার মত যন্ত্রণা নিয়ে বিছানায় ছটপট করছে। কিন্তু পরক্ষণেই সন্দেহ হল তোমাকে মুক্ত করে দিলেও সাদেক তোমাকে আদৌ স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে পরবর্তীতে গ্রহণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। কারণ থুথু মুখে নিয়ে হাঁটা যায়, কথা বলা যায় কিন্তু মুখ থেকে খসে গেলে চেটে তোলা যায় না। যদিবা সে তোমাকে গ্রহণও করে তবু সারাজীবন তোমার ব্যাপারে খুঁতখুঁতে থাকবে। তোমাকে এমন এক অনির্দিষ্ট পরিস্থিতির শিকার হতে দেব কি দেব না এরকম এক অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালায় যখন জ্বলছিলাম তখন মনই বলে দিল তোমার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াটা বাঞ্ছনীয়। এতে তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হবে। কারণ এমন কিছু ভুল মানুষ করে যা শোধরাতে গিয়ে আবার ভুল করে বসে। যার তীব্র দহন আজীবন মানুষকে পুড়িয়ে মারে। তোমাদের দুজনের ভুল হচ্ছে ঠিক এধরনের একটি ভুল। তোমাদের ভুলের শিকার হলাম শেষ পর্যন্ত আমিও।

এই বলে তোমার বন্ধুটি ক্ষান্ত হল কিছুক্ষণের জন্য। আকস্মিক আমার মাথা ঘুরে গেল।

www.pathagar.com

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। পানির ঝাপটায় একসময় জ্ঞান ফিরে এল। মাসুদকে চিন্তামগ্ন দেখলাম। বলল - দ্যাখো রীতা, তোমার এই মানসিক কষ্টের জন্য হয়তো আমিই দায়ী। একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই তোমাকে সাদেকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসব। বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের পথের কাঁটা হয়ে থাকতে চাইনি। শুধু সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না বলেই তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম বন্ধুপ্রতীম সাদেককে না জানিয়ে। আমার জন্য আমি আর ভাবতে চাই না। যে ছন্নছাড়া জীবনের সাথে আমি চিরকাল পরিচিত সে জীবনেই না হয় ফিরে যাব, কিন্তু তোমাদের দু'জনের কোন মনঃকষ্ট সইতে পারব না - একটা চাপা আর্তনাদের মত শোনালো মাসুদের কথাগুলো।

ওর সরল মুখের পানে চেয়ে রইলাম। ও আনাড়ী কিন্তু আমিতো অভিজ্ঞ। বাঁধনের সময় হানিমুনে তোমার সাতে মধুপুরের গড়ে ঠিক এভাবেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, কি মনে নেই ? সুতরাং আমি কি ধারণ করছি মাসুদের বুঝতে অসুবিধা হলেও আমার হয়নি। ওকে বললাম, তুমি আমার স্বামী, আর তোমারই ভালবাসার ফসল আমি ধারণ করছি। অতীত আমার কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন বর্তমানকে আমি অস্বীকার করি কিভাবে ?

মাসুদ অনুশোচনার স্বরে বলল, আমাকে ক্ষমা কর রীতা। ব্যাপারটি যে এতটুকু গড়িয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি। জীবনে কোন নারীকে অকারণে আমি বিব্রত করিনি এটাই ছিল আমার অহংকার, কিন্তু কেন যে আমি।

বিশ্বাস কর সাদেক, তোমার ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে সে আজকাল এমনই খামখেয়ালী হয়েছে যে, জীবনের সব খেই যেন হারিয়ে ফেলেছে। আমি ওকে সমগ্র শক্তি দিয়ে ধরে রেখেছি, নতুবা সে অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে এতদিন নিঃশেষ হয়ে যেত। ওকে বুঝিয়েছি, বিধি মোতাবেক আমি তোমার স্ত্রী। সে অধিকারে তুমি আমার উপর অধিকার খাটিয়েছ, তাতে তোমার ভুল হয়নি বরং তুমি যা করেছ তা ধর্মের বিধি মোতাবেক অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এতে তার অপরাধবোধ কিছুটা পাতলা হয়েছে।

পরদিন মাসুদ সাক্ষীদের নিয়ে স্থানীয় কাজীর কোর্টে গিয়ে দলিলের মাধ্যমে আমাদের সম্মন্ধকে পাকাপোক্ত করে এসেছে। কিন্তু সে তোমাকে ভীষণ ভালবাসে বলেই হয়তো তাকে অপরাধী ভাবে সারাক্ষণ। ইতোমধ্যে সে একটা প্রস্তাব নিয়ে আমার সাথে কথা বলেছে। তার একমাত্র বোন সেতু, যে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে, তাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে সে স্বস্থি পেতে চায়। তোমাকে সুখী দেখার সাথে সাথে সে আরো নিবিড় করে নিতে চায় তোমার সাথে তার সম্পর্কের দূরত্বকে। ভেবে দেখলাম, তার সিদ্ধান্তই আমাদের সকলের জন্য মঙ্গল। আশা করি সেতুকে বরণ করে নিতে তোমার আপত্তি নেই। বাঁধনও তার নতুন মা পাবে, একথা ভেবে আমিও একটু শান্তি পাব। বাঁধনের ন'বছর পূর্ণ হল। এ বয়সে শিশুমন অনায়াসে সবকিছু খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এখানে আসা অবধি মুহূর্তের জন্য ওকে ভুলতে পারছি না। যে আমাকে একটি মুহূর্ত ছেড়ে থাকার পাত্রী নয়,, আজ সে

www.pathagar.com

কিভাবে আছে জানি না ?

সাদেক! আমি তোমার সুখ দুঃখের সাথী ছিলাম দীর্ঘ বারোটি বছর। এ অধিকারে আশা করি সেতুকে গ্রহণ করতে রাজী হবে। এ বুকভরা আশা নিয়েই আমি তোমার মতামতের অপেক্ষায় থাকব। আমাদের ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে তোমার সহজ সরল বন্ধুটিকেও। মাসুদ দেশে যাওয়ার পাঁয়তারা করছে। ফিরে আসার সময় সেতু ও আমাকে ওমরাহ ভিসাতে নিয়ে আসবে। আমার পাসপোর্টে একজিট লাগিয়ে বাঁধনকে নিয়ে শিগগির আসবে সে আশায় পথ চেয়ে রইলাম। ইতি, রীতা।

এলোমেলো চিন্তা এসে ভীড় করে সাদেকের মনের গভীরে। তবে কি তারই ভুলে গোছানো সংসারটি তছনছ হয়ে গেল ? তাই বা কি করে হয় ? গত একবছর ধরে সামান্য কারণে অহেতুক ঝগড়া লেগেই ছিল রীতার সাথে। অতি সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ঝগড়ার রেশ ধরে ইতঃপূর্বে তার মুখে দুবার তালাক উচ্চারণ করতে বাধেনি। রীতার অস্বাভাবিক ব্যবহার এজন্য দায়ী। তৃতীয়বার উচ্চারিত হল ঝগড়ার এক চরম পর্যায়ে। ফল হল ভয়ংকর।

চিন্তায় ছেদ পড়ে সাদেকের, যখন অফিসবয় ঝড়ের বেগে তার রুমে এসে জানালো, বড়া সাহাব আপকো জরুরি তলব কিয়া।

টেবিলের একপাশে চিঠিখানা রেখে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যায় সাদেক বড় সাহেবের রুমের দিকে।

গ্রীক জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সিভাসতানীর সাথে গত পনরো বছর ধরে কাজ করে আসছে সে। নিজের কর্মনৈপুণ্য দেখিয়ে সুপারভাইজার থেকে একলাফে এসিস্টেন্ট সেইলস ম্যানেজার পদে উন্নীত হয়েছে অনেক দায় দায়ীত্ব মাথায় নিয়ে।

গুড মর্নিং স্যার। রুমে ঢুকতেই মিঃ সিভাসতানী সাদেকের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। কুশলবার্তা বিনিময়ের পর বলেন, আজ তোমাকে এত নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন সাদেক ? এ্যানি প্রোব্লেম ?

-মাই চাইল্ড ইজ সিরিয়াসলি সিক। গত দশদিন ধরে জ্বর ছাড়তেই চাইছে না।

-ডাক্তার দেখিয়েছ ?

-হাঁ, ওষুধ চলছে, আজ আবার যাব ডাক্তারের কাছে।

-অবিলম্বে ওর রোগমুক্তি কামনা করছি। আমি তোমাকে একটি সুখবর দেওয়ার জন্য ডেকেছি। আশা করি তুমি আমার উপর খুশি হবে এই ভেবে যে, সিভাসতানী গুণীর কদর দিতে জানে। তোমার কর্মনিষ্ঠার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত মনে করে আমাদের ইতালি ব্রাঞ্চের সেইলস ম্যানেজার পদের জন্য তোমার নাম কর্তৃপক্ষের কাছে ফরওয়ার্ড করলাম। কর্তৃপক্ষ তা মেনে নিয়েছে। কনগ্রাচ্যুলেশন মিঃ সাদেক। একটু ভেবে চিন্তে জানাও কবে চার্জ টেক-ওভার করতে পারবে ?

সাদেক তাকিয়ে থাকে মিঃ সিভাসতানীর মুখের পানে ভাবলেশহীনভাবে। এমন একটি সুসংবাদ জানার পরও সাদেকের মুখায়বে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন না দেখে মিঃ সিভাসতানী পুনরায় বলে ওঠেন, এ্যানি থিং রং মিঃ সাদেক ? এ ধরনের একটি অফার পেয়েও তুমি

www.pathagar.com

খুশি হওনি ? আশ্চর্য. কি হয়েছে তোমার ? আমিতো আশা করেছিলাম সিভাসতানীর মুখের কথা মুখেই রয়ে যায়।

আই সুড বি গ্রেটফুল টু ইউ স্যার ফর সাচ এ গুড নিউজ। বাট আই হ্যাভ সাম সিরিয়াস ফ্যামিলি প্রোব্লেম. পিওরলি পার্সোনেল। আই ডোন্ট নো হাউ আই উড ট্যাকেল ইট। বাট আই হোপ. আই ক্যান ওভারকাম দি প্রোব্লেম উইথইন দি কামিং ডেইজ।

তুমি কি ভেবে বলছ ? চান্স নেভার কামস অলওয়েজ। জীবনে আকস্মিক ভাবে আসে। এটাকে হাতপেতে নিতে হয়। তুমি আমাকে নিরাশ করেছ সাদেক। কর্তৃপক্ষ যদি জানে তাহলে তোমার স্থলে অন্যজনকে রিপ্লেস করবে। বুঝতেই পারছ এমন অফার কে না লুফে নেবে ? আই হোপ ইউ উইল কাম টু মি উইথ এ পজিটিভ আন্সার বাই টুমরো দি লেটেস্ট আই উইস ইউ গুড লাক। ইউ মে গো নাও।

- আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট. থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। ধীর পদক্ষেপে চিন্তিত মনে বেরিয়ে আসে সাদেক বড় সাহেবের রুম থেকে।

সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের হাতছানি এ মুহূর্তে তার কাছে নিষ্প্রভ এক প্রদীপের মত মিট মিট করে জ্বলছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের লড়াইয়ে যেন সে হেরে যাচ্ছে। কি হবে প্রমোশন দিয়ে ? এ ধরনের খবরে সবচেয়ে যে বেশি খুশি হত আজ সে অন্যের বাহুডোরে বন্দিনী। টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি তাকে তন্ময় করে দেয়। সুপারভাইজার থেকে সহকারি সেইলস ম্যানেজার পদে উন্নীত হওয়ার পর প্রমোশন লেটার নিয়ে বাসায় ফিরছিল। ফেরার পথে রীতার জন্য দু'গাছা সোনার বালা কিনে নিতে ভুলেনি।

দরজা খুলে দিতেই কৃত্রিম সুরে রীতাকে বলল। এ্যাই. কাল হতে চাকরি নেই. বুঝেছ? অবিলম্বে সবকিছু গুটিয়ে নাও শিঘ্রই দেশে ফিরে যেতে হবে।

- তোমাদের জেঃ ম্যানেজার সিভাসতানীর চাকরি আছে ?

- ওর চাকরি থাকবে না মানে ?

- ও জীবন থাকতে তোমাকে যে ছেড়ে দিবে সেটাও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

- বিশ্বাস হয়না. না ? তাহলে এই নাও ছাড়পত্র। রীতার ব্লাউজের একফাঁকে চিঠিখানা গুজে দিয়ে জুতা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সাদেক।

- পড়তে হবে না। বলেই ফেলোনা বোনাস কত পেয়েছো ?

- কি দেবে ?

- যা চাও তাই দেব। কোনকিছুর কম আছে তোমার জন্য তোমার এই বউটির কাছে ?

- তাই না কি ? তাহলে এক্ষুণি গত পরশুদিন যে খয়েরী কাতান শাড়িটি কিনে দিয়েছিলাম তা পরে আস।

- ঠিক আছে পরব। আগে বলনা কত পেয়েছ ? হাত ধুতে ধুতে প্রশ্ন করে রীতা।

- তোমার মুখেই অংকের উচ্চারণটা শুনাবে ভাল। কাগজটা খুলে একবার পড়েই দেখো না।

ব্লাউজের এক ফাঁকে গুজে থাকা অফিসিয়াল এনভেলাপটি চোখের সামনে মেলে ধরে

www.pathagar.com

রীতা বিস্ময়ে বলে উঠে। সহকারী সেইলস ম্যানেজার ? বোনাস নয়, প্রমোশন ! তোমাকে যেন ভয় ভয় করছেগো। ঠিক আছে এক্ষুণি শাড়ি পরে আসছি। এমন সুখবর শুনে আমি কি বসে থাকতে পারি ? - এই এলাম।

ড্রেসিংরুমে গিয়ে হালকা মেক-আপ শেষে সাদেকের কথানুযায়ী শাড়িটি পরে কাছে এসে বলেপ বলুন মহাশয় এখন কি করতে হবে ?

- চোখ বুজে দু'হাত বাড়াও।

- দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে রীতা বলে, এই বাড়ালাম।

- দু'হাতে দুটি সোনার বালা পরিয়ে দিয়ে সাদেক বলে এখন চোখ খোল।

- এত বড় বড় বালা? কি সুন্দর দেখতে? কত হয়েছেগো? তোমার পছন্দের তারিফ করতেই হয়। তা এত দামের জিনিষ কেনার কি দরকার ছিল?

- তোমার দামের তুলনায় অবশ্যই তা হাজার গুণে কম। তোমাকে এই শাড়িতে আর বালাতে যা সুন্দর লাগছে না - মনে হচ্ছে এক্ষুণি একটা কাণ্ড ঘটাই। বাঁধন কোথায়?

- ও তো সেই দুপুর থেকে একনাগাড়ে ঘুমুচ্ছে।

- ঠিক আছে, বেডরুমে চলো। কতকাল তোমাকে অফিস হতে ফিরে এভাবে দেখিনি। মেঘলা আকাশে ফুলবাগানের মাঝখানে ফুটে থাকা টাটকা রক্তগোলাপ দেখেছো কখনও? মনে কর তুমি হচ্ছ এখনের সেই দুর্লভ রক্তগোলাপ।

- সাহেবের মতলবটাতো খুব একটা ভাল মনে হচ্ছে না।

- বিশ্বাস যদি না হয় তাহলে আমার এই চোখ দুটো একবার তোমার চোখে লাগিয়ে দেখো?

মে আই কাম ইন স্যার? আগন্তুক ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে আকস্মিক চিন্তায় ছেদ পড়ে সাদেকের।

- ইয়েস - কাম ইন।

- জেঃ ম্যানেজার মিঃ সিভাসতানী আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি ওরিয়েন্ট কার্গো কোম্পানি থেকে এসেছি। আমরা খুব কম্পিটেটিভ রেইটে জলে বা স্থলে মালামাল পৌঁছে দেই। আপনার নাকি দরকার লাগতে পারে স্যার, জি, এম তাই বললেন।

- আমার কিছু মালামাল তায়েফ যাবে - পারবেন? আর কতদিন লাগবে?

- মাত্র দু'দিনের ভিতর আমাদের লোকজন আপনার দেওয়া লিস্ট অনুযায়ী সব মালামাল বাসা হতে কালেকশন করে তায়েফে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবে স্যার।

- ঠিক আছে, আমি লিস্ট বানিয়ে নিয়ে আসব। কাল আপনি এলে কন্ট্রাক্ট পেপারে সই করব - কেমন?

- থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, এখন আসি।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে সাদেকের বুক চিরে। কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারছেনা। রীতার ও বাঁধনের পাসপোর্টে এগজিট লাগানোর কাজ আগামীকাল দুপুরের

www.pathagar.com

আগেই সেরে নিতে হবে।

ক্রিং ক্রিং ফোন আবার বেজে উঠতেই ফোন উঠায় সাদেক। ওপাশ হতে বাঁধনের কণ্ঠ ভেসে আসে - বাপ্পি, আমার মাথা যে পুড়ে যাচ্ছে। তুমি আসছ না কেন ? ওদের সাথে কথা বল বাপ্পি ...।

- কার সাথে? কাদের সাথে?

এবারে কণ্ঠ ভেসে আসে প্রতিবেশী ফিলিস্তানী মহিলার। আপনার মেয়ের জ্বরের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ভীষণ বমি করছে। বুদ্ধি করে দরজা খুলে আমাকে ডাক না দিলে এতক্ষণে যে কি হত? তা মেয়ের মা কোথায় - দেখছিনা যে?

- ও আমার এক বন্ধুর বাসায়। ঠিক আছে, এক্ষুণি আসছি - আপনি দয়া করে মেয়ের পাশে একটু বসুন।

দশমিনিটের মধ্যেই সাদেক এসে বাসায় পৌছে। ঘরে ঢুকতেই ফিলিস্তানী মহিলা বাঁধনকে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে কেটে পড়ে।

পাঁজাকোলা করে বাঁধনকে নিয়ে গাড়িতে উঠিয়েই পাশাপাশি মাগরাবী হাসপাতালের ইমারজেন্সির উদ্দেশ্যে গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দেয় সাদেক।

ডাক্তার বাঁধনের নাড়ী পরীক্ষা করে জ্বর নামার ওষুধ ও ইনজেকশন দিয়ে বলল - যদি বিকালের ভিতর জ্বর না ছাড়ে তাহলে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

বাসায় ফেরার পথে হোটেল হতে তার ও বাঁধনের জন্য কিছু খাবারদাবার কিনে নিতে ভুলেনা সাদেক। ঘন্টাখানেক পর বাঁধন বলে - বাপ্পী, আমি এখন অনেকটা সুস্থ। চলনা, তায়েফে গিয়ে মামণিকে নিয়ে আসি? মামণিকে নিয়ে এলে আমি সুম্পুর্ণ সুস্থ হয়ে যাব সে তুমি দেখে নিও।

- ঠিক আছে। আজ এবং কাল সকালে আমার জরুরি কিছু কাজ আছে। কাল বিকেলে তোমাকে নিয়ে যাব কথা দিলাম।

- সত্যি বলছ?

- মায়ের কাছে কেউ মিথ্যে বলে না কি? কাল যাবোই যাব - দেখে নিও, কেমন?

সারারাত জেগে লেখাপড়ার কাজে মগ্ন থাকে সাদেক। তার যে অনেক কাজ। পাশেই বাঁধন ঘুমুচ্ছে। গায়ে হাত দিয়ে জ্বরের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখে। অনেকটা কমার পথে। বাঁধনের কপালে চুমু খেয়ে চুলে বিলি কেটে দেয়। এ মেয়েটি তার হৃদয়ের সব কটি জায়গা দখল করে আছে। এতটুকুন মেয়ে মা ছাড়া কেমন করে এতদিন ঠিক আছে ভাবতে গিয়ে তার দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসে। দু'ফোটা অশ্রু বাঁধনের গালে গড়িয়ে পড়তেই চোখ মুছে সাদেক।

পরদিন সকালে অফিসে এসে মিঃ সিভাসতানীর সাথে প্রথমে দেখা করে সাদেক। সুন্দর পোশাকে আজ তাকে ভীষণ মানিয়েছে। অফিস সংক্রান্ত কিছু আলোচনার পর সাদেক তার সম্মতি জানায়। সিভাসতানী খুশি হয়ে সাদেকের কাঁধে ঝাকুনি দিয়ে বলেন - গুড্ লাক্ সাদেক - আগামী ছয়মাসের মধ্যেই আমাকে ইতালিতে তোমার পাশাপাশি পাবে -

www.pathagar.com

স্মার্ট ম্যান - .. দ্যাটস হোয়াই আই লাইক ইউ আই লাইক ইউ ভেরি মাচ।

কথানুযায়ী বাঁধনকে নিয়ে বিকেলের দিকে তায়েফে রওয়ানা দেয় সাদেক। বাঁধন আজ মহাখুশী। খই ফুটছে মুখে। গায়ে এখনো জ্বর আছে তবে সহ্য করার মত।

- পাহাড়গুলো কি সুন্দর, তাই না বাপ্পী? ঐ দ্যাখো, কি সুন্দর পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা মেঘগুলো লেপটে আছে যেন তুলোর মত - চেয়েই দ্যাখোনা বাপ্পী ! ও বুঝেছি এজন্যই বোধহয় মামণি ফিরে আসছে না। বাপ্পী, দ্যাখো, দ্যাখো - কি সুন্দর চারটি বানর আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে - ওরা বোধহয় আমাদের সাথে তায়েফ যেতে চায়। গাড়িটা একটু থামাও না বাপ্পী - প্লিজ? দেখি ওরা কি করে? আমার যে কি খুশি লাগছে !

- এই থামালাম। এক কাজ কর - তোমার বিস্কুটের প্যাকেট হতে চারটি বিস্কুট আর চারটি কলা ওদের দিকে ছুঁড়ে মারো - দেখবে ওরা খুব মজা করে খাবে।

কথানুযায়ী বাঁধন ওদের কলা ও বিস্কুট গাড়ির জানালাপথে ছুঁড়ে দিতেই বানরগুলো লুফে নিল। বাঁধন তা দেখে আনন্দে নেচে উঠে।

আঁকা বাঁকা পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে সামনে আল-হাদা হাসপাতাল নজর পড়তেই গাড়ির গতি শ্লথ করে দেয় সাদেক। এই হাসপাতালে ডাঃ মিজানসহ বেশ কয়েকজন পরিচিত বাঙ্গালী ডাক্তার রয়েছেন। ওখানে বাঁধনকে পুনরায় পরীক্ষা করিয়ে নিলে কেমন হয়?

ইমারজেন্সি রুমে যাওয়ার পথেই ডাঃ মিজানের সাথে দেখা হয়ে যায় সাদেকের।

- আরে সাদেকভাই যে? কেমন আছেন? কতদিন হল দেখিনি? মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে ওর শরীরে জ্বর আছে। ভাবিকে আনেন নি? একসাথে অনেকগুলো কথা বলে সাদেকের সাথে করমর্দন করতে থাকেন ডাঃ মিজান।

- তা আপনি কেমন? তায়েফে যখন আসলাম তখন আপনাদেরকে না দেখে যাওয়ার প্রশ্নই উঠেনা, তাছাড়া ভাবলাম বাঁধনকে এই সুযোগে একটু পরীক্ষা করিয়ে নেয়া যাবে। প্রায় দশদিন থেকে জ্বর। আজ একটু ভালোর দিকে।

- ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না। এক্ষুণি পরীক্ষা করে ভাল ওষুধ দেব। জ্বর ছাড়তেই হবে - ছাড়বে না কেন? বোধহয় সঠিক এনটিবায়োটিক পড়েনি।

- আমি না হয় কিছুক্ষণ পরে এসে ওকে নিয়ে যাব। ততক্ষণে আপনি পরীক্ষাগুলো সেরে নিন। ওর মা আমার এক বন্ধুর বাসায়। ঘন্টাখানেকের মধ্যে আসলে চলবে?

- হাঁ - চলবে ।

মামণি, তোমার এই আঙ্কেল অনেক বড় ডাক্তার। তোমাকে পরীক্ষা করে ভাল ওষুধ দেবেন। এরমধ্যে আমি তোমার মাসুদ আঙ্কেলের অফিস হতে একটু ঘুরে আসি - কেমন?

ঠিক পাঁচটায় মাসুদের অফিসের গেটে পৌঁছে সাদেক। সবাই একে একে বেড়িয়ে আসছে। গেটের সামনে সাদেককে অপেক্ষমান দেখে পিছনে হতে কাঁধে ঝাকুনি দিতেই চমকে উঠে সাদেক।

- আরে, তোর সম্মুখ দিয়েই আসলাম - দেখিসনি?

www.pathagar.com

- না তো?

- আশ্চর্য্য ? ঠিক আছে বাসায় চল। বাঁধনকে আনিস নি?

- ওকে আল-হাদা হাসপাতালে ডাঃ মিজানের তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছি। গায়ে জ্বর। ঘন্টাখানেক পর নিয়ে আসব।

- সিরিয়াস কিছু নয়তো?

- মনে হয় মানসিক যন্ত্রণা অসুখের প্রধান কারণ।

- রীতার চিঠি পেয়েছিলে?

- হ্যাঁ।

- আমি তোর বন্ধু। বিশ্বাস করেই আমার স্মরণাপন্ন হয়েছিলি কিন্তু কেন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। মানসিকভাবে আমি কতটুকু অপরাধী হয়ে আছি তা তোকে কিভাবে বুঝাবো? নিশ্চয়ই রীতার পত্রে সবকিছু জেনেছিস।

- নিজেকে এত অপরাধী ভাবছিস কেন? যা ভাগ্যে ছিল তাই ঘটেছে। আমি মেনে নিয়েছি, আশা করি তুইও মেনে নিবি। যতটুকু সম্ভব নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করে সাদেক।

- আমাদের সেতুর ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিস? তাহলে ধরে নিতে পারি আমাদের প্রস্তাবে তুই রাজি?

- ঠিক আছে, একটুখানি ভাবতে দে ... সময়তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছেনা যে এখনই তোকে উত্তর দিতে হবে।

উঁচু টিলার উপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে হাঁফাতে থাকে সাদেক। বলল- এত উপরে বাসা নিয়েছিস?

- আমার চাকরি কি আর তোর মত? কম পয়সার বাসা অনেক উপরেই হয়।

বাসার গেটের কাছে পৌঁছে হাঁফাতে হাঁফাতে সাদেক বলে - এখানেই একটা চেয়ার দে ভাই। বাইরে একটু বসি। পাহাড়ের গায়ে লেপটে থাকা ভাসমান মেঘগুলো দেখতে খুবই ভাল লাগছে।

- ঠিক আছে তোর যেখানে ইচ্ছা বস। এর মধ্যে আমি গোসলটা সেরে আসি।

এক কাপ চা নিয়ে হাজির হয় রীতা। গেইটের বাইরে এসে দেখে সাদেক পিছন ফেরে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পাহাড়গুলোর দিকে। যেন এক ধ্যানমগ্ন সন্যাসী। নিজের উপস্থিতি কিভাবে বুঝাবে সে? এত কাছের লোকটি আজ কত দূরের! দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কাপ প্লেটে টুং টাং শব্দ করতেই সাদেক সোজা হয়ে বসে।

- এই নাও তোমার চা।

- মাটিতেই রেখে দাও।

- বাঁধনের শরীর এখন কেমন?

- দশদিন হল জ্বর। আজ বেশ ভালোর দিকে। আল- হাদা হাসপাতালে ডাঃ মিজানের কাছে ভালভাবে পরীক্ষার জন্য রেখে এসেছি। ঘন্টাখানেক পর নিয়ে আসব।

www.pathagar.com

এক অজানা আশংকায় কেঁপে উঠে রীতার হৃৎপিণ্ড। কাঁপা কাঁপা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে - এতদিন আমি জানতে পারিনি কেন ? ও কি আমার কিছু নয় ?

- নিজে থেকে খবর নিয়েছিলে ?

- সুযোগ পাইনি, তাছাড়া ফোন করলে ওর মন আরো বেশি খারাপ হবে বলে করিনি। আমার চিঠি পেয়েছিলে ?

- পেয়েছি।

- তোমাকে না জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে আসতে হল বলে মনে কিছু করনিতো ?

- কারণতো চিঠিতেই ব্যক্ত করেছ।

- তোমার পিঠে এখনো এলারজিক বের হয় ?

- মধ্যে মধ্যে হয়।

- কে চুলকিয়ে দেয় - বাঁধন ?

- চুলকাতে হয়না, চুলকানোকে জয় করে নিয়েছি।

- নিজেই রান্নাবান্না কর, রান্নাবান্না শিখেছ ?

- না, কিন্তু এতসব জিজ্ঞাসার মানে ...?

- এমনিতেই ..। তোমার পায়ের জ্বালাপোড়া কিছু কমেছে? - একটু থেমে প্রশ্ন করে রীতা।

- পায়ের জ্বালাপোড়া মনের চেয়ে বেশি নয়। কথাটি বলে হকচকিয়ে উঠে সাদেক। কি বলতে কি বেরিয়ে এলো অজান্তে। প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্য স্বাভাবিকতা রক্ষা করে বলে - মাসুদ কোথায় ?

- বাথরুমে।

- তুমি না হয় ওখানে যাও। ওর হয়তো কিছুর প্রয়োজন হতে পারে।

- উনি আমার উপর এত নির্ভরশীল নন। প্রয়োজনীয় জিনিষ সাথে নিয়েই বাথরুমে ঢুকেছেন। তারপর একটু থেমে বলে - তোমার এবং বাঁধনের খাওয়াদাওয়া নিশ্চয় হোটেলে চলছে ?

- আমার এবং বাঁধনের মত হাজার হাজার লোকজন হোটেলেই খায়। প্রয়োজনে মানুষ সবই পারে। অভ্যাস মানুষের দাস।

- সিগারেট খাওয়া কমিয়েছ ?

বাড়িয়েছি কি কমিয়েছি - তাতে তোমার কি? কথাটি বলতে গিয়েও সাদেকের কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে যায়। না, রাগের সময় এখন নয়। যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বলে উঠে

- মাত্রা একটু বেড়েছে বলে মনে হয়।

- এত সিগারেট খাও ? এতে ফুসফুসের ক্ষতি হবে যে ? আগেতো এক প্যাকেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলে।

- ফুসফুসের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু বডড কিছু একটা বলতে গিয়ে সাদেক থেমে যায়। প্রসঙ্গ এড়াতে গিয়ে বলে - মাসুদ বোধহয় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে -

www.pathagar.com

সেদিকে যাও।

- বাথরুমে যাওয়ার প্রাক্কালে তোমার ভালমন্দ জানার জন্য বলে গেলেন। তাইতো খবর নিচ্ছি। আমার দিকে একবারও তাকালে নাতো ?

- তেমন কোন প্রয়োজন আছে কি ?

- বেদনার বহ্নিশিখা চিতার আগুনের মত রীতার মনে জ্বলে উঠে দপ করে। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে - ভাত বসিয়েছি, একটু দেরি হবে। আরো এককাপ চা দেই ?

- না ভাবি। এখানে আসার পথে কয়েকদফা হয়ে গেছে। রাতের ঘুমের ব্যঘাত হবে।

- ভা - বি ! হৃদয়ের সমস্ত শাখাপ্রশাখা ভেঙ্গে যেন এ মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। কান্নাজড়িত গলায় বলে - ও নামে না ডেকে রীতা ডাকলেই অধিক খুশি হতাম। ফুঁফাতে ফুঁফাতে ঘরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় সে।

চেয়ার ছেড়ে সাদেক এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলে - সত্যকে সত্য বলেই মেনে নিতে হয় তা যতই কঠিন হোকনা কেন? বন্ধুপত্নীকে কেউ কোনদিন নাম ধরে ডাকে না, ভাবি বলেই ডাকে। ও, হাঁ - বাঁধন একটি চিঠি লিখেছিল তোমার কাছে অনেক আগে। পোস্ট করা হয়নি সময়মত। এই নাও। মাসুদকে বলো আমি হাসপাতালে যাচ্ছি বাঁধনকে আনতে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এসে পড়ব।

চোখ মুছতে মুছতে সাদেকের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে রীতা একদৃষ্টে। যা সত্য তা-ই সে বলেছে। একবর্ণও মিথ্যে বলেনি। যে বন্ধন টুটে গেছে তাকে মেনে নেওয়ার নামইতো জীবন। কিন্তু মন এত সহজে তা মানতে চায়না কেন ? বাঁধনের চিঠির কথা মনে হতেই খাম ছিঁড়ে চিঠি আলগা করে চোখের সামনে মেলে ধরে।

এতদিন হয়ে গেল, তুমি ফিরে আসছনা কেন মামণি ? তুমি না বলেছিলে সপ্তাহখানেক পরে চলে আসবে। তোমাকে ছেড়ে আমার কিছুই ভাল লাগছেনা মামণি। জানো, - বাপ্পী রাতে একেবারে ঘুমায়না। শুধু সিগারেট খায় আর হাঁটে। বাপ্পী বলেছে তুমি নাকি হাসপাতাল থেকে একটি ছেলে বেবী নিয়ে আসবে, সত্যি নাকি মামণি? তাহলে তো খুব মজা হবে। একা একা খেলতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। তাড়াতাড়ি ছেলে বেবীটাকে নিয়ে চলে এসো মামণি। তোমারই - বাঁধন।

বাঁধনের চিঠি বুকে চেপে ধরে রীতা। অশান্ত মনের সমস্ত জ্বালা যেন হৃদয় বিদীর্ণ করে দেবে এই মুহূর্তে। শ্রাবণের বৃষ্টিধারার মতই চোখ প্লাবিত করে নেমে আসে অবাধ্য অশ্রুর বন্যা। কোন কথা না বলে বাঁধনের চিঠিখানা এগিয়ে দেয় বাথরুম ফেরত মাসুদের হাতে। মাসুদ এক পলক চিঠিতে চোখ বুলিয়ে সাদেককে ডাকতে থাকে। কোন সাড়া না পেয়ে রীতাকে শুধায় - সাদেক কোথায় ?

- বাঁধনকে আনতে গেছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে রীতা। এদিকে মাসুদও চিন্তার অবগাহনে ডুবে রয়। কারোর মুখে যেন কোন কথা জুটছে না।

বাঁধনকে মাসুদের বাসার পাশে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসতে গিয়ে সাদেকের পা যেন জড়িয়ে যায়। উঁচু টিলার কয়েকটি সিড়ি উঠতেই সাদেক পুনরায় বাঁধনকে ডাকে - মামণি

www.pathagar.com

আরেকটি কথা শুনে যাও - আর মাত্র একটি ...।

সাদেকের ডাকে ফিরে এসে বাঁধন বলে - এই নিয়ে দু'বার ডেকে নামিয়েছ। পাপ্পীতো অনেক দিয়েছে। তুমি ফিরে এলে আরো দিব। কিছু বলার থাকলে তাড়াতাড়ি বলেই ফেলোনা? বারে বারে নামতে কষ্ট হয় যে ?

- কিছু বলার নেই মা। আরেকটি বার বেশি করে আমার বুকে পাপ্পী দিয়ে যাও না। মা! - মাগো! আমার বুকটা যে জ্বলে যাচ্ছে মা। চোখের অশ্রু আর বাধ মানে না সাদেকের।

- জ্বলবে না ? কতদিন না তোমাকে বলেছি সিগারেট না খেতে - শুনেছ?

- আচ্ছা, আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করছি আর খাব না। তবে তোমাকে আমার একটি কথা রাখতে হবে - কেমন ?

- খাবে না ! সত্যি বলছ ?

- তোমার কাছে কোনদিন মিথ্যে বলেছি ?

- ঠিক আছে তাড়াতাড়ি বলো। আমি কিন্তু মামণির কাছে অনেকদিন থাকব, তাতে কিন্তু বাধা দিতে পারবে না বলে দিলাম।

- তোমার যতদিন ইচ্ছে থাকবে। দরকার হলে সারাজীবন থাকবে, কিন্তু আমার আসতে দেরী হলে কথা দাও কাঁদতে পারবে না। আমি তো তোমার কথা রাখলাম, তুমি রাখবে তো? এই দ্যাখো এখনই তোমার সামনে সিগারেটের প্যাকেট ফেলে দিচ্ছি।

- ঠিক আছে, কাঁদব না। তবে তুমি এখন কাঁদছ কেন ? চোখ মুছ বলে, দিনে দিনে বয়স বাড়ছে না কমছে বল দিকিন ? তায়েফের আঙ্কেল যদি তোমাকে কাঁদতে দেখেন তাহলে লজ্জা কোথায় রাখবে বলতো ?

এত দুঃখেও সাদেকের হাসি পায়। চোখ মুছে বলে কানে কানে যা বলে দিলাম তা মনে থাকবেতো ?

- হাঁ - সবকিছু মনে আছে।

মাসুদ ও রীতার প্রতীক্ষায় ভাটা পড়ে কচিকণ্ঠে 'মামণি' ডাক শুনে। মামণি আমি এসে গেছি। দ্যাখো, তোমার জন্য কতকিছু নিয়ে এসেছি। হাসতে হাসতে এগিয়ে যায় বাঁধন।

- আমার কলিজার টুকরো। আমাকে দেখতে এসেছো ? চুমুতে চুমুতে বাঁধনকে পাগল করে তোলে রীতা। তোমার অসুখ সেরেছে মামণি?

- অসুখ ছিল কিন্তু ভাল হয়ে গেছি। দ্যাখো, কত ওষুধ নিয়ে এসেছি। আমি ঠিকমত ওষুধ খাব, তুমি দেখে নিও।

- তোমার বাপ্পী কোথায় ? মাসুদ বাঁধনকে আদর করতে করতে বলে।

- বাপ্পী গাড়ি নিয়ে ওদিকে কোথায় যেন গেল। আর এই এনভেলাপটা আপনাকে দিতে বলেছে।

- এনভেলাপে আবার কি ? রীতা প্রশ্ন করে।

- অ-নে-ক টাকা আর জরুরি কাগজপত্র। খুলেই দেখোনা 'মামণি'। জানো, বাপ্পী

www.pathagar.com

বলেছে এখন হতে আমি তোমার কাছেই থাকব। এখানে অনেক বানর আছে। রাস্তায় বানরগুলো কি করেছিলো জানো ?

- ঠিক আছে পরে শুনব। তুমি বাইরে গিয়ে পাহাড়গুলো দেখ। এরমধ্যে তোমার বাপ্পীর চিঠিটা পড়ে নেই - কেমন ? মাসুদের দিকে চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বলে একটু জোরে পড়।

মাসুদ! বন্ধু আমার! তোদের দু'জনের উদ্দেশ্যে আমার এ পত্র লিখা। হাতে সময় খুবই অল্প। বাঁধন নিশ্চয়ই তার মাকে পেয়ে খুশি। তোদের কাছে আমার কলিজার টুকরো বাঁধনকে রেখে গেলাম। আজ হতে তুই তাকে নিজের মেয়ে বলেই জানিস। লেখাপড়া শিখিয়ে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিস। তোদের দু'জনকে আমার চাকরি জীবনের গচ্ছিত ব্যাংকের সমুদয় টাকা ও যাবতীয় স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি উপহার হিসাবে দিয়ে গেলাম। এর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র রইল।

ওদের দু'জনের পাসপোর্টে একজিট লাগানো হয়েছে। সাথে টিকেটও রইল। দেশে গেলে সম্পত্তির কাগজপত্র ঠিক করে আসিস।

তোর বোন সেতুকে ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে আসবি। আর মাত্র তিন চার ঘন্টার ভিতর আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি চিরতরে - দূরে, ব-হু-দূ-রে। আর কোনদিন দেখা হবে না বন্ধু।

তোর বাসার সামনে রয়েছে আচ্ছাদিত পর্বত, এটির ঠিক উপরে দেখবি একটি উজ্জ্বল তারা। মধ্যে মধ্যে মেঘ এসে তাকে ঢেকে দেয়, কিন্তু তার উজ্জ্বল জ্যোতি ঠিকরে বেরিয়ে আসে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। আমি ঐ মেঘে ঢাকা তারার মতই তোদের তিনজনের শুভ কামনা করে যাব দূর থেকে। তোরা সুখে থাক বন্ধু।

অশ্রুসিক্ত মাসুদের বুক থেকে বেরিয়ে আসে পাথরচাপা এক দীর্ঘনিঃশ্বাস। ভেঙ্গে পড়া রীতাকে টেনে নিয়ে আসে বাইরে। পর্বতশৃঙ্গের ঠিক উপরে ঝিলমিল মেঘে ঢাকা তারাটির দিকে চেয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, "সাদেককে ওখানেই মানায় রীতা"।

কোন উত্তর না দিয়ে এলোকেশী রীতা পাগলিনীর মত সন্ধ্যার অন্ধকারে নতজানু হয়ে মাটিতে খুঁজতে থাকে কিছুক্ষণ আগের এক অতি পরিচিত পদচিহ্ন।

* * *

www.pathagar.com

দারুচিনি দ্বীপে

ঠিক দুবছরের মাথায় জেদ্দা হতে ঢাকাগামী বাংলাদেশ বিমানের ডিসি ১০-এ চড়ে বসেছে আসিফ। বেআইনীভাবে বসবাসের অপরাধে একসপ্তাহ জেলবন্দী থেকে দেশে ফিরে যাওয়ার মধ্যে তার কোন অনুতাপ নেই। দেখতে দেখতে দু'বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। প্রবাসে এসেছিল বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য তার সফল হয়েছে। অনেক আগেই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নিজেকে গোছাতে গিয়ে সময়টা কিভাবে যে গড়িয়ে গেল তা সে টেরই পায়নি। আজ নিজেকে বড় হালকা মনে হচ্ছে মুক্ত স্বাধীন পাখির ন্যায়।

যেন তর সইছে না আসিফের। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। জীবনের শুরুতে যে আলো-বাতাসে সে চোখ মেলেছিল, যে মাটির ঘাসফুলের সবুজ নরম গালিচায় তার দেহ-মন গড়াগড়ি খেয়ে বড় হয়েছে, সে মাটির আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাকুল আহবান তার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝড় তুলেছে। এ ঝড় মহামিলনের, আনন্দের, মহাসমারোহের।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্বেই বিমানটি তার বিশাল বপু নিয়ে আকাশে উড্ডয়ন করল। রোমাঞ্চিত হল আসিফের দেহমন এক অজানা পুলকে। জানালাপথে দৃষ্টি মেলে দেখে মুহূর্তে মর্তের মানুষ, চলন্ত যানবাহন, আর বিশাল বিশাল অট্টালিকাগুলো ক্ষুদ্র হতে হতে একসময় বিন্দুতে মিলিয়ে গেল। আকাশের নীল সামিয়ানায় সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে বিমানখানা ঠিক পূর্বদিকে আসিফের স্বপ্নরাজ্যে। জানালা দিয়ে বিস্তৃত মহাশূন্যে চোখ রাখে সে। থোকা থোকা তুলোর মত সাজানো মেঘের ভেলার তুলতুলে বিছানায় আসিফের দেহমন অজান্তে গড়াগড়ি খায়। কালো ও ধূসর মেঘের আবরণ ভেদ করে বিমানখানা এগিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট গন্তব্যে। পুঞ্জীভূত মেঘামালায় ভর করে মনও ওড়ে চলে নীল নীল নিঃসীমে। মনের অলিন্দে ভাসছে একটি মুখ। সে ফরিদার। জমে থাকা পাহাড়সম সাদাকালো মেঘের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে সে ফরিদার পেছনে অথচ, তার সাথে সে পেরে উঠছে না কোনমতেই। হাসতে হাসতে ফরিদা নাগালের বাইরে পালিয়ে যাচ্ছে। কখনো কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তার দীঘল কালো চুলরাশিকে ইচ্ছা করেই ঢেকে রাখছে যাতে আসিফ খুঁজে না পায়। ক্লান্তিবিহীন এ লুকোচুরি খেলার অন্ত নেই। একসময় ফরিদা পিছন হতে কালো মেঘগুলোকে দু'হাতে ফাঁক করে পিছন হতে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে তাকে বলে, এবার ক্ষান্ত দাও সাহেব। সারাদিন চেষ্টা করলেও খুঁজে পাবে না। আমি যদি ধরা না দেই তাহলে সাধ্যি আছে তোমার ? হাসি পায় আসিফের। পাশের সিটের বাঙালি ভদ্রলোক বলে ওঠেন, কি সাহেব, বড় হাসছেন যে ? সম্বিত ফিরে পায় আসিফ। মুখ ঘুরিয়ে বলে - না, এমনিতেই ..।

এক জেদের মাথায় এসেছিল সে সৌদিতে। ফরিদার বাবা অর্থাৎ আব্দুস সাত্তার চাচা তাকে যদি তুচ্ছ জ্ঞান না করতেন, তাহলে হয়তো জীবনের ধারা আজ অন্যরকম হত। আই, এ পাশ ছেলের কাছে বি,এ পাশ মেয়ের বিয়ে কেমন করে হয় ? তবু যদি বিদেশী হত সেক্ষেত্রে না হয় একটু ছাড় দেওয়া যেত - দাড়িতে হাত বুলিয়ে গম্ভীরভাবে কথাটাকে

www.pathagar.com

যুক্তির পাল্লায় খাড়া করতে চেয়েছিলেন তিনি।

এককালের পরম বন্ধু আজীজ মাস্টারে কথায় আহত হয়ে বলেছিলেন, আসিফের লেখাপড়া তেমন কম কিসে ? আই, এ পাশ করে তো বছরখানেক প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ট্রেনিং দিল। এ ট্রেনিং না দিলে সেও তো বি.এ পাশ করে বেরুতো। আর মেয়েতো অনেক আগেই আমাকে দিয়ে দিয়েছ দোস্ত, এখন আবার ওকথা কেন ?

তবু ডিগ্রির একটা মূল্য আছে না ? মেয়েরও তো একটা মুখ আছে। শিক্ষিত মেয়ে বলে কথা ... তোমার আমার যুগতো কবে বাসী হয়ে গেছে দোস্ত ... এটা বুঝতে চাও না কেন ? ছেলেটাকে বলো ডিগ্রিটা নিয়ে নিতে। মেয়েতো তোমারই রইল।

আহত পাখির ন্যায় ছটফট করে ওঠে আজিজ মাস্টারের হৃদয়। কোন কথা না বলে হন হন করে বাড়ির পথে পা বাড়ান তিনি। আত্মসম্মানে ঘা লাগে দারুণভাবে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রবাসে পাড়ি দেয়ার প্রস্তুতি নেয় আসিফ। বিদেশে যেতে পারাটা যদি ফরিদাকে পাওয়ার সার্টিফিকেট হয় তাহলে যাবে না কেন ? ট্রেনিং-এ থাকাকালীন সময়ে শহরে ফরিদার সাথে কতবার দেখা হয়েছে। দু'পিতার অভিলাষের কথা তাদের দু'জনের অজানা ছিল না। এজন্য পরস্পরের মনের গোপন কোণে অনুরাগও কাজ করছিল।

কলেজ হোস্টেলে থেকে পড়তো ফরিদা। আসিফের সাথে দেখা হত প্রায়ই। কলেজ বন্ধ হলে ফরিদাকে গ্রামের বাড়িতে মাঝেমধ্যে নিয়ে আসার দায়িত্বও ছিল তার ওপর। শহর থেকে একদিন ফেরার পথে ফরিদা বলেছিল, আচ্ছা আসিফ ভাই, ট্রেনিং শেষে কি করবেন বলে ভাবছেন ?

ভাববো আবার কি ? বাবার ইচ্ছা ট্রেনিংটা নিয়ে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করি। বাড়ির ছেলে বাড়িতেই থাকি। তাছাড়া আমাদের তো আর খাওয়াপরার জন্য তেমন ভাবতে হচ্ছে না। আল্লাহ যা দিয়েছেন চাকরি না করলেও সংসার চলবে। তবু সম্মানের খাতিরে একটা কিছুতো করতে হবে। তাই বাবার ইচ্ছাতে রাজী হয়ে গেলাম।

চাচী-তো আপনাকে সংসারী দেখতে খুব ইচ্ছে। আপনার কি মত ? কথাটা বলতে গিয়ে ফরিদা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে। এ ধরনের প্রশ্ন না করলে কি হতোনা ? কথা পাল্টানোর ছলে অন্য কথা পাড়ে - বাড়ি পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে ?

ট্রেন সময়মত ছাড়লে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাব। একটু থেমে আসিফ পুনরায় কথার খেই ধরে বলে, আর বাবার ইচ্ছার কথা যে বললে তা পূরণ করার ব্যাপারে তুমি আমাকে কি করতে বল ? তোমারও তো একটা মতামত আছে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে আসিফ।

এ প্রশ্নের উত্তর ফরিদার জানা থাকলেও প্রকাশের ভাষা জানা নেই। এক অস্বস্তিকর শূন্যতা দু'জনকে স্তব্ধ করে দেয় পরমুহূর্তে।

এরপরের ঘটনা সাদামাটা। ফরিদা বি.এ পাশ করেছে দ্বিতীয় বিভাগে; আর আসিফ পি.টি. আই থেকে ট্রেনিং শেষ করেছে সফলতার সাথে।

চাকরির ব্যাপারে একটা কিছু হলেই আজিজ মাস্টার বন্ধু আব্দুস সাত্তারের কাছে

www.pathagar.com

কথাটা পাড়বেন মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু চাকরি হতে দেরি হবে জেনে ভাবলেন, শুভ কাজটা সেরে নিলে কি এমন ক্ষতি ? বয়সের ভারে নুয়ে পড়ছে শরীর, কখন কি ঘটে যায় বলাতো যায় না ? কিন্তু কথাটা বন্ধু আব্দুস সাত্তারের কাছে পাড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হল দারুণভাবে।

এ কথা মায়ের কাছে শুনার পর সোজা ঢাকায় গিয়ে ট্রাভেল এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে ওমরাহ ভিসা নিয়ে আকস্মিক পাড়ি জমায় আসিফ সৌদিতে। এখানে আসার মাসখানেক পরেই বে-আইনী লোক ফেরত পাঠাবার পুলিশী তৎপরতার চাপে পড়ে পরিচিত এক বন্ধুর সহায়তায় সে জেদ্দা হতে দুইশত কিলোমিটার দুরে মদীনাহাইওয়ের পাশাপাশি পেট্রোলপাম্পের পাশেই একটি রেস্টুরেন্টে চাকরির অফারটা লুফে নেয়। ওখানে পুলিশের সন্ধানী চোখ নেই। রেস্টুরেন্টের মালিক বে-আইনী লোকদেরকে দিয়েই রেস্টুরেন্ট ব্যবসা চালাচ্ছে। মাসান্তে সাতশ রিয়াল পারিশ্রমিক পেয়েই সন্তুষ্ট ছিল আসিফ। খাওয়া থাকার খরচ নেই। বদাভ্যাসও নেই। তাই সব রিয়ালই বেঁচে যায়। মাঝে মধ্যে বাবাকে কিছু কিছু টাকা পাঠায়। এ পর্যন্ত যা জমেছে তা দিয়ে দেশে গিয়ে কিছু একটা করতে পারবে।

দুবছরে ফরিদা নিশ্চয়ই সাংসারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে অনেক। ভাল রান্নাবান্না থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর অনেক কলাকৌশল। প্রবাসে পাড়ি দেয়ার প্রাক্কালে ছোট্ট একটি চিরকূট ফরিদাকে লিখে পাঠাতে ভুলেনি সে।

"চাচার অনুমোদন পেতে হলে আমাকে প্রবাসের সার্টিফিকেট নিতে হবে যে কোন মূল্যে। বাবা তোমাকে মনেপ্রাণে বড়বউ হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন। বাবার সে স্বপ্ন ব্যর্থ হোক তা আমি চাই না। চাচাকে খুশি করেই তোমাকে ঘরে তুলব। শীঘ্রই ফিরে আসব - সে দিনটির প্রতীক্ষায় থেকো"।

ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণের মধ্য দিয়ে আসিফের ভাবনার রেশ কেটে যায়। তাড়াতাড়ি ইমিগ্রেশন শেষ করে হাতের স্যুটকেসটি নিয়ে গ্রীন চ্যানেল দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। এক অজানা শিহরণে মনটি তার দোল খেতে থাকে। গ্রামের বাড়ি পদ্মাপারের আলমপুর। ঢাকা হতে মাত্র তিনঘন্টার পথ।

দেড়হাজার টাকা ভাড়া সাব্যস্ত করে বিকল্পের একটি ট্যাক্সিতে চেপে বসে আসিফ। এক মিনিট বিলম্বর মোটেই সহ্য হচ্ছে না। পাখির মত যদি তার দুটো ডানা থাকত তাহলে এতক্ষণ অপেক্ষার প্রহর গুণতে হতনা। এয়ারপোর্টের রূপালী ব্যাঙ্কের শাখায় ডলারগুলো ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে আগেভাগেই। হাতে শুধু স্যুটকেস, যাতে রয়েছে ফরিদাসহ সবার জন্য উপহারসামগ্রী।

ফরিদাদের বাড়ি পেরিয়ে তাদের বাড়ি যেতে হয়। পাঁচমিনিট ওদের বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে গেলে কেমন হয় ? ফরিদার স্বহস্তে তৈরি একগ্লাস লেবুর শরবত পানের মধ্য দিয়ে ওকে দেখা, উপরন্তু চাচার প্রতিক্রিয়াও যাচাই করা যাবে। হয়তো ফরিদা লেবুর শরবত দিতে এসে অভিমানে বলবে, দু'বছরে একটি চিঠি তো দিতে পারতেন ? আপনার মত এমন শক্ত মানুষ জীবনে দেখি নি।

www.pathagar.com

বিকল্প ট্যাক্সি আলমপুর বাজারে পৌঁছতেই ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় আসিফ। পথে পরিচিতদের অনেকেরই কুশল জেনে নেয়। একটি জিনিষ সে লক্ষ্য করে আসছে। সবাই যেন তাকে কিছু লুকোচ্ছে। শৈশবের খেলার সাথী মাশুকের সাথে দেখা হলে মাশুক বলল, বড় দেরি করে ফিরলে দোস্ত। ছ'টি মাস আগে ফিরলে কতনা ভাল হত।

এ কথার মানে ?

তুই কি কিছুই জানিস না ? - মাশুক প্রশ্নবান ছুঁড়ে ?

না তো ? কি ব্যাপার ?

আগে বাড়ি যা, তারপরই জানতে পারবি।

মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে দেখা হতেই, তিনি বললেন, বাবা আসিফ! কবে বিদেশ হতে ফিরলে ?

এইমাত্র চাচা ।

কারোর চিঠি পেয়ে এসেছো ? খবর সময়মত পেয়েছিলে ?

কিসের খবর ? কার কথা বলছেন চাচা ?

কেন, তোমাদের পরিবারের কথা ?

কিছু বুঝতে পারছিনা চাচা ? কি হয়েছে পরিবারের লোকদের ? স্পষ্ট করে বলুনতো?

ওহ- তুমি দেখি কিছুই জান না। ইমাম সাহবে বিস্ময়াবিভূত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, আগে বাড়ি যাও। গেলেই সব জানতে পারবে। কথাটি বলে হন হন করে পা বাড়ান মসজিদ পানে।

এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে আসিফের হৃৎপিন্ড। অকল্যাণজনিত কিছু যে একটা ঘটেছে তা আঁচ করে নেয়। নিশ্চয়ই বাবা অথবা মায়ের একটা কিছু !

ফরিদাদের বাড়ি পেরিয়ে তাদের বাড়ি যেতে হয়। আরো একমাইল পথ বাকি। পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী ফরিদাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে আসিফ।

চাচা আছেন ? আমি আসিফ। সৌদি হতে ফিরেছি।

কে ? কে তুমি ? লাটিতে ভর করে আব্দুস সাত্তার চাচা গেইটের বাইরে আসেন।

ওহ্ - বাবা আসিফ ! কখন ফিরলে ? তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? ভেতরে আস ? এ্যা...ই, কে কোথায় আছ ? দেখে যাও কে এসেছে ?

চাচী কাছে এসে দাঁড়াতেই আসিফ কদমবুচি করে দাঁড়ায়।

থাক, থাক হয়েছে বাবা। তারপর কেমন আছ ? পথে কোন অসুবিধা হয়নিতো ?

না, চাচী - কোনই অসুবিধা হয় নি। শুধু বিমানটি ছাড়তে ঘন্টাখানেক দেরি হয়েছে এই যা।

এই কুলসুমের মা! তাড়াতাড়ি একগ্লাস লেবুর শরবত নিয়ে আয়তো, বাবা আমার গরমে নেয়ে এসেছে।

অস্থির হবেন না চাচী। আমি বেশ আছি। আপনাদেরকে পেয়ে জার্নির সব কষ্ট ভুলে গেছি। তা - ওরা সব কোথায় ?

www.pathagar.com

কার কথা বলছ, বাবা ? আশিকতো কাশিপুরে। আজই ফেরার কথা। তুমি কাপড় ছাড়ো বাবা। হাতমুখ ধোও। সবেমাত্র এলে, একটু বিশ্রাম নেও, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আব্দুস সাত্তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে ইশারায় কিছু একটা জানালেন।

খাওয়া দাওয়া শেষে সাত্তার চাচা আস্তে আস্তে মুখ খুললেন। বাবা, প্রায়তো দু'বছর হয়ে গেল, একটি চিঠিতো দিতে পারতে।

আসিফ এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল। মোটামুটি একটি উত্তরও ঠিক করে রেখেছে এজন্য। বলল - চাচা, আমি যেখানে ছিলাম সেটা একটি গণ্ডগ্রাম। কোন পোস্টঅফিস নেই। গত দু'বছরে বাবার কাছেও একটি চিঠি দিতে পারিনি। অনেক বলে কয়ে পরিচিত একজনকে দিয়ে দু'বার কয়েকটি টাকা পাঠিয়েছি মাত্র। চলে আসব করে করে কেমন করে দু'বছর পার করে দিলাম, বুঝতেই পারিনি। আমার এ অপারগতা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি।

এই টাকা পাঠানোই তোমার বাবার জন্য কাল্ হলো।

কেন চাচা ? কাল্ হতে যাবে কেন ?

দ্যাখো বাবা, তোমাকে সবকিছু বলতেই হবে। আমরা ছাড়া তোমার আপনজন আর কে আছে ? একটি চেক পেয়ে তোমার বাবা শহরে ব্যাঙ্কে গেলেন। টাকাগুলোও উঠালেন। বাড়ি ফেরার পথে কোথা থেকে নিয়ে এলেন কলেরার বীজ। আশেপাশের গ্রামের সব ডাক্তার কবিরাজ ডাকলাম, কিন্তু শেষ রক্ষা কেউই করতে পারল না। কলেরার সাথে যুদ্ধ করে মাত্র তিনদিন বেঁচে ছিলেন। তারপর এই আত্মঘাতী রোগ পরপর তোমার ভাই ও মা'কে মাত্র একসপ্তাহ সময় দিয়েছিল। কি আর বলব বাবা ? সবই তকদিরের ফের।

আসিফ ভেঙ্গে পড়ে কান্নায়। চাচা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, মাথা ঠাণ্ডা রাখো বাবা, ভেঙ্গে পড়লে কি চলবে ? আরো কথা আছে। এ ঘটনা ঘটে প্রায় ছ'মাস পূর্বে। ইতঃপূর্বে ফরিদার ভালো ভালো সম্মন্ধ আসছিল। কিন্তু সে কিছুতেই বিয়েতে রাজী নয়। এদিকে তোমারও কোন খবর নেই। তার মনের কথা বুঝেও কিছু করতে পারছিলাম না। পাশের গ্রাম কাশীপুর থেকে তোমার বাবাই একটি ভাল প্রস্তাব নিয়ে এলেন। ফরিদাকে তোমার বাবা অনেক বুঝিয়ে রাজী করালেন। বললেন - মা, আমি তোমার মনের কথা জানি, কিন্তু যেখানে আমার ছেলের কোন হদিস নেই ! কবে দেশে ফিরবে তাও ঠিক নেই ... তাছাড়া ভালো সম্মন্ধ সবসময় আসে না। সুতরাং প্রস্তাব পায়ে ঠেলে দিও না মা। তোমার বাবা মা'র ইচ্ছার দিকেও তোমার খেয়াল রাখা দরকার। কোনরকমে ফরিদাকে বুঝিয়ে তিনিই পার করলেন। কিন্তু মেয়েটির কপালে কি ছিল কে জানে। কথাটি শেষ হল না, ডুকরে কেঁদে ওঠেন। অসমাপ্ত কথা মুখের ভিতর পাঁক খেতে খেতে জিহবার নিচে ঢাকা পড়ে।

বোবা কান্না কালো মেঘের রূপ ধরে হৃদয়াকাশে গুমোট মেরে আছে। আকস্মাৎ তা ভারি হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। নিজেকে আর সামলাতে পারছে না আসিফ। এক অব্যাক্ত বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে তার হৃদয়ের সমস্ত শাখা প্রশাখা। ভাষার পাখি যেনো বোবা হয়ে নিঃসীম নীলিমায় ওড়াল মেরেছে। চা -চা - া - া -া, একি শুনলাম চাচা, শ্রাবণ বরিষণের মত প্রবল ঝাপটা দিয়ে চোখ প্লাবিত করে বেরিয়ে আসে অবাধ্য অশ্রুর বন্যা।

তার সাথে সুর মিলিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন চাচা। আসিফকে জড়িয়ে ধরে বলেন -

www.pathagar.com

বলতে পার বাবা, কেন আমি বেঁচে আছি আমার বন্ধুকে হারিয়ে ? আসিফ! তুমি আমার ছেলে আশিকের মত। আজীবন তুমি ছেলে হিসাবেই থাকবে। বল - এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবে না ?

চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায় আসিফ। শান্তভাবে বলে - চাচা, আমি একটু ঘুরে আসি। ব্যাগটি রইল। ফরিদার প্যাকেটটি কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। উত্তরের অপেক্ষা না করেই চোখ মুছে বেরিয়ে পড়ে আসিফ। পদ্মাপারের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে অনেকদূর। মনটা যেন ঝাঝরা হয়ে গেছে বেদনার নীল ক্ষতে। পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ তার কাছে এ মুহূর্তে অর্থহীন। এক বিরাট শূন্যতা তার মনকে গ্রাস করে। কোথায় যাবে সে ? কে আছে তার এ পৃথিবীতে ? প্রবাসের দু'বছরের জীবনে যাকে নিয়ে একটি স্বপ্নের বাগান সাজিয়েছিল সেও আজ নাগালের বাইরে। সবাইকে হারিয়ে বেঁচে থাকার অর্থ কোথায় ?

স্রোতস্বিনী পদ্মার বুকে পাল তুলে হাজারো সাম্পান ভেসে যাচ্ছে দূর দূরান্তে। নদীর পারে ডিঙ্গি নিয়ে অপেক্ষমান এক মাঝিকে দেখে কাছে গিয়ে আসিফ জানতে চায় - মাঝি ভাই! এ ডিঙ্গি বানাতে আপনার কত খরচ হয়েছে ?

তা প্রায় তিন-চার হাজার টাকা। কেন, একটা বানাইতে চান ?

আমি যদি আপনাকে এ ডিঙ্গির বিনিময়ে অনেক টাকা দেই তাহলে বিক্রি করবেন ?

মাঝি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে - টাকা বেশি পেলে কেন বিক্রি করবো না ? তবে আমার সাথে মসকরা করত্যাছেন, মিয়াভাই ?

এয়ারপোর্টে ভাঙ্গানো টাকার তোড়াটি গুঁজে দেয় আসিফ মাঝির হাতে। আশ্চর্য হয়ে মাঝি বলে, এত টা - কা ? আপনি কি পাগল অইছেন, মিয়াভাই ?

না, আমি পাগল নই। এসব টাকা সবই আপনার। মাঝিভাই। টাকা আমাকে কিছুই দেয় নি। এ টাকার জন্যই আমি হারিয়েছি অনেককিছু। সময় আমার খুব কম। এ ডিঙ্গি নিয়ে আমি যেতে চাই অনেক দুরে, যেখানে নদী মিশেছে সাগরে আর সাগর, মিশেছে মহাসাগরে। সেই মহাসাগরে ভাসতে ভাসতে আমি খুঁজবো নির্জন একটি দ্বীপ। যেখানে প্রিয়জন হারানোর ব্যথা নেই। কাউকে হারানোর ব্যথা মনকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায় না।

মাঝি ভাবে লোকটি নিশ্চয়ই পাগল ? মনের ভাব মনে গোপন করে বলে, মিয়াভাই! সমুন্দরে যাইবেন হেটোতো পরের কথা, ডিঙ্গি নিয়া আপনিতো পদ্মা-ই পার অইতে পারবেন না। ডিঙ্গি নিয়ে কেউ সমুন্দরে যায় ?

মাঝির কথায় কান না দিয়ে স্রোতের প্রবল টানে ভরাযৌবনা পদ্মার বুকে আসিফ তার সদ্য কেনা ছোট্র ডিঙ্গিখানা ভাসিয়ে দিতে দিতে বলে, মাঝিভাই! আমার একটি অনুরোধ রাখবেন ?

কি করতে অইব কন মিয়াভাই ?

আলমপুর বাজারে আব্দুস সাত্তার সাহেবের বড় দোকানে গিয়ে বলবেন, আসিফকে যেন ক্ষমা করেন, কথাটা রাখতে পারলো না বলে ?

ঢেউয়ের তালে তালে ডিগবাজি খেতে খেতে আসিফের ডিঙ্গিখানা এগিয়ে চলে সাগরপানে। টাকাগুলো পকেটে ঢুকাতে গিয়ে মাঝির হাত যেন এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠে। কড়কড়ে নোটগুলো দুআঙ্গুলের ফাঁকে যেন কাঁটা হয়ে বিঁধছে। ভেসে যাওয়া ডিঙ্গির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মাঝি। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে ততক্ষণে। ক্রমেই অন্ধকার গ্রাস করবে পৃথিবীকে। মাঝির মনে পড়ে যায় ৭১' এর ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় উৎসব করতে গিয়ে তার একমাত্র ছেলে আলী দু'বন্ধুকে নিয়ে এমনি ভরা গাঙ্গে ডিঙ্গি ভাসিয়েছিল, ওরা আর ফিরে আসেনি। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয় মাঝির।

www.pathagar.com

কেন সে বিক্রি করতে গেল ডিঙ্গিটি হুজুগের বশে? নিস্তেজ হয়ে যাওয়া দু'আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে টাকার বান্ডিলটি গড়িয়ে পড়ে নদীবক্ষে। বুক চিরে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে এক অব্যক্ত বেদনায়। চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অবাধ্য অশ্রুর অবিরল ধারা। নদীপারের নরম মাটিতে হাটুগেড়ে বসে আকাশপানে দু'হাত তুলে মাঝি কাতর মিনতি জানায়, হে আল্লাহ! পাগলটারে তুমি রক্ষা করিও - যদিও জানি ভরাগাঙ্গে ওর রক্ষা নেই। বুকফাটা আর্তনাদ খরস্রোতা পদ্মার ঢেউয়ের সাথে মিশে মিলিয়ে যায় দুরের দিগন্তরেখায়।

আসিফের ডিঙ্গি দ্রুতবেগে ডিগবাজী খেতে খেতে এগিয়ে চলে তার কল্পিত দারুচিনি দ্বীপের সন্ধানে। দাঁড় ধরে স্থবির বসে আছে সে। সম্মুখে প্রসারিত উদাস দৃষ্টি। ঢেউ এসে ডিঙ্গিতে আছড়ে ভেঙ্গে পড়ছে বার বার। ভিজিয়ে দিচ্ছে পরণের কাপড়। অস্তগামী সূর্য বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলোর রক্তিমাভা পূব আকাশে ভাসমান মেঘকে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে বধূবেশে। বিমানে বসে সে এ মেঘের আবরণে ফরিদাকে নিয়ে কল্পনায় লুকোচুরি খেলছিল। স্বপ্ন কত মধুর আর বাস্তব, কত নির্মম - এ সত্য আসিফের চেয়ে ভাল আর কে বুঝবে এ মুহূর্তে।

সামনেই কাশিপুর গ্রাম। আসিফের মনবনে পোষা এক সাধের ময়না উড়ে এসে এগ্রামেই ঘর বেঁধেছে। কয়েকঘন্টা আগেও মনে ছিল তার কৃষ্ণচুড়ার লাল রং। কি বিচিত্র অনুভূতি মিশিয়ে ফরিদার জন্য সে গেঁথেছিল মালিকা, সাজিয়েছিল বাসর। সে ফুলফোটানো মনের বাগিচা প্রবল বৈশাখী ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে। পিতা, মাতা ও ছোটভাইকে নিয়ে সাজানো সংসারটিও অকালে ঝরে গেল। কি রইল আসিফের জন্য ? মনের এ শূন্য বনে স্নেহ ভালবাসার প্রলেপ দিয়ে যে সবুজ করে দিতে পারত এ মুহূর্তে সেও অন্যজনের। যে মাটির মায়ায় সে ফিরে এসেছে সে মাটি তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। একটি তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস বক্ষ ভেদ করে তীরের ফলার মত বেরিয়ে আসে আসিফের।

বাতাসের তীব্রতা বাড়ছে। ঢেউগুলো ভয়ঙ্কর রূপে এগিয়ে আসছে এক এক করে। ডিঙ্গিখানি উল্টে যেতে চায় টাল সামলাতে না পেরে। আসিফ শক্ত হাতে দাঁড় ধরে রাখে। দূরে উজানে ভেসে আসছে একটি বড় পানসি নৌকা স্রোতের প্রতিকূলে। আসিফের বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা। আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে ডিঙ্গিটাকে কোনরকম পানসি নৌকাটির কাছাকাছি নিয়ে যেতে। বড় ধরনের আর একটি ঢেউ আসলে ডিঙ্গিটি তলিয়ে যাবে নদীর গহীন অতলে। পানসির মাঝিকে দুহাত তুলে বিপদ সংকেত জানায়। প্রবল স্রোতে ডুবতে ডুবতে ডিঙ্গিখানা পানসির কাছে পৌঁছতেই মাঝি ভারি একটি রশি ছুঁড়ে দেয় আসিফের দিকে। রশিটি পেয়ে দাঁড় ছেড়ে ডিঙ্গির সাথে শক্ত করে বাঁধে সে এবং রশি বেয়ে তড়িৎ গতিতে পানসির গলুইতে পৌঁছার চেষ্টা করতেই মাঝি দু'হাতে আসিফকে তুলে নেয় শক্ত সুঠাম হাতে।

হাঁপাতে থাকে আসিফ। মাঝি একটু বিরক্তিভরা স্বরে বলে - মরতে বের অইছেন ডিঙ্গি নিয়ে এই পদ্মার বুকে মিয়াভাই ? কই যাইবার লাগছেন? দেখ্‌তেতো ভালা মানুষ লাগে - মাথায় ছিট আছে নাকি ? বাড়ি কই আপনের ?

সংযতভাবে উত্তর দেয় আসিফ - আলমপুর।

আলমপুর ? কার ছেলেগো আপনে ?

আজিজ মাস্টারের - ছ'মাস আগে গত হয়েছেন।

কি কইলেন ? আমাগো মাষ্টার সাহেবের ছেলে আপনে ? আ-হা-রে, ওমন মানুষ দুইন্যাতে আর জন্মাবে কিনা সন্দেহ। ওই ধরেন, সাত আটমাস আগে উনি আমার এই পানসিতে করে দলহীনরে নিয়া ফিরাযাত্রায় এই কাশীপুরে আইছিলেন। আমি খুব ভালা

www.pathagar.com

কইর‍্যা চিনি। যে দুলহীনকে নিয়া আইছিলাম হেই দুলহীনরে নিয়া আবার আলমপুর যাইত্যাছি কিন্তু মাস্টার সাহেব দুইন্যা ছাইর‍্যা চইল্যা গেছেন, আহারে... কি শুনাইলেন মিয়াভাই ? খারাপ মানুষ দুইন্যায় থাইক্যা যাইবো, আমাগোর মরণ নাই, ভালো মাইনসরে দুইন্যাটা সহ্য করতে পারেনা..। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নেয় মাঝি।

সূর্য তখন বিদায় নিচ্ছে। ক্রমেই ধেয়ে আসছে অন্ধকার। সেই অস্পষ্ট আলোয় একটি নারীমূর্তি নীরবে আসিফের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। ভাবলেশহীন, চোখে অশ্রু, দৃষ্টি দূরে ঢেউয়ের পানে নিবদ্ধ।

ভূত দেখার মতই চমকে উঠে আসিফ - একি, তুমি এখানে ? এটা কি করে সম্ভব ?

এই দুর্যোগপূর্ণ নদীর বুকে ডিঙ্গি নিয়ে কোথায় চলেছ ? মরতে ? কার জন্য ? কি তোমার অভিপ্রায় জানতে পারি ? দুরে দৃষ্টি নিবদ্ধ এক মানবীর শান্ত অথচ দৃঢ় প্রশ্নের আকস্মিক উত্তর খুঁজে পেতে দেরি হয় আসিফের। ঢোক গিলে বলে, মরব আবার কার জন্য ? কে আছে আমার এ পৃথিবীতে ? বাঁচতে চাই বলেইতো ভাসিয়েছিলাম ডিঙ্গি - ওখানে আমাকে পৌঁছতেই হবে - সেটা হয়তো অনেকদুরের পথ - নির্জন একটি দারুচিনি দ্বীপ - হারানোর ব্যথা বুকে নিয়ে ওখানে কষ্ট পেতে হয় না। এখানে আর এক দণ্ডও নয় - কিসের মায়ায় আমি এ গ্রামে পড়ে থাকবো বল ? নির্মম এ পৃথিবী আমার জন্য কিছুই রেখে যায়নি। খুঁজতে খুঁজতে এ পৃথিবী হতে যদিবা হারিয়ে যাই সেটাও হবে আমার পরম পাওয়া। ঢেউয়ের তাণ্ডব একটু থেমে গেলেই পথ দেব আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে। এ লক্ষ্য হতে পৃথিবীর কোন মায়া আমাকে ফেরাতে পারবে না ...।

কখন এলে? সংযত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর। বাতাসে উড়ছে একরাশ দীঘল কালো চুল।

আজই।

আমার শশুরের মৃত্যুসংবাদ সময়মত পেয়েছিলে ?

তোমার শশুর ? কি বলছ ? তোমার শশুর আবার কবে মারা গেলেন ? তাতো জানিনা? চাচাতো একথা বলেননি আমাকে !

এ মৃত্যুসংবাদ আমাকে জানানো হয়নি। গতকাল আশিক এসে বলার পর জানতে পেরেছি। আশিক আমার সাথেই আছে, ভিতরে ঘুমুচ্ছে। ওনার সাথে শেষ দেখা হয়েছিল এই পানসিতেই। আমাকে দুলহান বেশে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। উনিই আমাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন। শত বাধা বিপত্তির চাপে আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলেছিলেন - মা, ছোটবেলা থেকেই তোমাকে পুত্রবধূ হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলাম কিন্তু আশা অপূর্ণ রয়েগেল। কার জন্য অপেক্ষা করবে বল, যেখানে ছেলের কোন হদিস নেই ?

ওনার কথা শুনে কেঁদেছিলাম প্রচুর, কিন্তু লাভ হয়নি। শুধু একটি কথা আদায় করতে পেরেছিলাম। শশুরের মর্যাদা নিয়ে আজীবন তিনি আমার মনে বিরাজ করবেন। আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলেনপ এটাতো আমার মনের কথা - তুমি কেমন করে জানলে মা? নারীহৃদয়ের এক ব্যাকুল মমতা কেঁদে বুক ভাসিয়ে গলাটাকে আড়ষ্ট করে দেয় ফরিদার।

আসিফের মুখে কথা জোগায় না। ভাষা যেন বোবা কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে অশান্ত ঢেউয়ের মত তার হৃদয় সমুদ্র তোলপাড় করছে। পৃথিবীর প্রতি শেষ মমতাটুকু যেন নিঃশ্বেষ হয়ে গেছে। মাথাটা ভন ভন করে ঘুরছে। অন্ধকার হয়ে ওঠে চোখের দৃষ্টি। টাল সামলাতে না পেরে গলুই হতে ছিটকে পড়ে নদীবক্ষে।

চীৎকার করে উঠে ফরিদা। নৌকার পাটাতনে হাটু গেড়ে নিচের দিকে চেয়ে পাগলের মত বলে উঠে - আমার কথা শেষ হয়নি আসিফ। বিয়ের দু'দিনের মাথায় বিধবা হয়েছি। সে

www.pathagar.com

হয়তো তোমারই জন্য। মরতে তোমাকে আমি দেব না কষ্টের মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তোমারই প্রতীক্ষায় দিন গুণে গুণে শুধু ধড় নিয়ে এখনো বেঁচে আছি। আর এই সামান্য নদী হতে তোমাকে উদ্ধার করতে পারবো না ? শক্ত করে ধরে রাখো আসিফ - তোমার ডিঙ্গিতে করে আমিও যাব সেই দারুচিনি দ্বীপে, যেখানে আছে দারুচিনির খোশবু ভরা মিষ্টি ভালবাসা, সে ভালবাসার খোশবু নিয়ে আমি নতুন করে তোমাকে নিয়ে বাঁচতে চাই আসিফ। তুমি না বলেছ, ওখানে হারানোর ব্যথা নেই ! এত কাছে এসে দুরে চলে যাবে আমাকে না নিয়েই? আমার জীবন থাকতে সে হতে দেব না.... !

একটি আর্তচীৎকারের মধ্যে দিয়ে ঝাপ দেয় ফরিদা নদীবক্ষে আসিফকে লক্ষ্য করে। ধরতে গিয়েও পারে না। প্রচণ্ড ঢেউ এসে আলাদা করে দেয় তাদের দুজনকে মুহূর্তে। ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করে আবারো এগিয়ে যায় কিন্তু ধরাছোঁয়ার এই খেলায় শেষ পর্যন্ত তাকে ঢেউয়ের কাছে নতি স্বীকার করে নেতিয়ে পড়তে হয়।

মাঝির চিৎকারে আশিকের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ রগরাতে রগরাতে নৌকার ছই হতে দৌড়ে বেরিয়ে আসে। মাঝির মুখে বিস্তারিত শুনে খুঁজতে থাকে ফরিদাকে নদীবক্ষে। আবছা আলোয় দেখতে পায় প্রবল ঢেউয়ের তালে তালে ভাটির টানে ভেসে যাওয়া দুটো দেহের উপর মাঝি সেজে বসে আছে দুটো গাংচিল পরম নির্ভয়ে। দলের অন্যান্যরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওপরে চক্রাকারে ঘুরছে।

বুবু - উ-উ-উ। এ তুমি কি করলে বুবু-উ ? আশিকের বিলাপ উত্তাল ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে প্রতিধ্বনিত হয়ে তারই কানে ফিরে আসে বুমেরাং-এর মত।

* * *

www.pathagar.com

প্রজাপতি মন

মাত্র বিশ রিয়াল ... স্রেফ বিছ্ রিয়াল .. এশ্‌রিন রিয়াল ফাকাৎ ... বেন্‌টি রিয়ালাং ... ওনলি টুয়েনটি রিয়ালস..।

বাংলা, উর্দু, আরবি, ফিলিপিনো ও ইংলিশের সংমিশ্রণে কাস্টমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শাহেদ। চীন ও জাপানে তৈরি ওমেক্স এবং ক্যাসিও ব্রান্ডের এক একটি ঘড়িতে লাভ থাকে তিন হতে পাঁচ রিয়াল। দিনান্তে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ষাট সত্তর রিয়ালের মত। তার মধ্যে দশ রিয়াল করে দিতে হয় ওয়াচম্যানদেরে। ওয়াচম্যানদের কাজই আলাদা। দশ পনর মিটার দূরত্ব বজায় রেখে পুলিশ আর মিউনিসিপ্যালিটির লোকদের উপর শ্যান দৃষ্টি রাখা। ধর-পাকড়ের গন্ধ পেলেই প্রথম সংকেত ধ্বনি বেজে উঠবে। বুঝতে হবে পুলিশের লোকজন ধারে কাছেই আছে। দ্বিতীয় সংকেতের অর্থ ধর-পাকড়ের প্রস্তুতি চলছে, আর তৃতীয়টি হল ধর-পাকড় চলছে, পালাও নিরাপদ দূরত্বে।

সপ্তাহের প্রতিদিন রুটিন বাঁধা। কোন্‌দিনের কোন্ জায়গায় ফেরিওয়ালাদের হাট বসবে তা পূর্ব নির্ধারিত। ফেরি করে রুজি করা - এটা সাময়িক ব্যবস্থা। যাদের চাকরি নেই বা চাকরি খুঁজছে, তারাই কেবল এ লাইনের সদস্য। বেঁচে থাকার জন্য এটা এক নিরলস সংগ্রাম।

একই কারণে বাধ্য হয়ে ফেরি করে শাহেদ। রিসিপ্টশনিস্ট-এর চাকরির জন্য কত ধর্ণা দিয়েছে গত দশ বছরে তার ইয়ত্তা নেই। চাকরির অফার যে পায়নি তা নয়, তবে সব ক'টিই লেখাপড়ার কাজ। যে কাজটি করতে পারবে না সে আজীবন। মুক্তিযুদ্ধে যদি সে ডান হাতটি না হারাতো তাহলে তার জীবন আজ অন্যরকম হত।

বেন্‌টি রিয়ালাং ..... ফিলিপিনো কাস্টমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়েই ঘটে গেল ব্যাপারটি। পিছন হতে কে যেন খপ্ করে ধরল তার ডান হাতের কব্জিতে। বাম হাতে ধরা ঘড়িসমেত ব্রিফকেসটি ফসকে পড়ে যায় মাটিতে। তাকিয়ে শাহেদের বুঝতে অসুবিধা হয় না ছদ্মবেশী পুলিশকে। শাহেদের হাত ধরে অপেক্ষমান ভ্যানের দিকে পুলিশ যেই না সজোরে টান দিল, অমনি প্লাস্টিকের হাতটি পুলিশের চৌদ্দ গোষ্ঠীকে নীরবে অভিশম্পাত দিতে দিতে রাস্তায় খসে পড়ল। শাহেদ কুঁকড়ে উঠে ব্যথায়।

পুলিশ আরবিতে চুক চুক শব্দ করে বলে উঠে - তোমার হাতটা কি সত্যিই আসল হাত নয় ? আমি দুঃখিত ...।

বে-আইনী ব্যবসার অপরাধে শাহেদকে ফিরে আসতে হয়েছিল দেশে। প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে কনুইয়ের সাথে প্লাস্টিকের হাতটি ফিক্স করা হয়েছিল ভারতের পুনা হাসপাতালে। বিশবছর মেয়াদি হাতখানা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই খসে গেল।

পৈত্রিক সম্পত্তির শেষ একবিঘা জমিটুকু বিক্রি করে এক বন্ধুর সহায়তায় সৌদিতে এসেছিল শাহেদ। গত দশবছরে ফেরি করে যা কামিয়েছে তার সিংহভাগই পাঠিয়ে দিয়েছে গ্রামের স্কুলটি মেরামতের কাজে যা একাত্তরে হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

সৌদি হতে ফিরে খালার বাড়িতেই উঠে শাহেদ। আপন বলতে তার এই খালাই এখনো জীবিত।

কিরে, আজ না তোর হাসপাতালে যাবার কথা ? একগ্লাস দুধ নিয়ে হাজির হন খালা।

হাঁ, সাতটার বাসে করেই মিটফোর্ড হাসপাতালে যাব। ওখানে জার্মানি হতে প্লাস্টিক সার্জনদের একটি দল এসেছে লায়ন্স ক্লাবের সৌজন্যে।

তোর হাতের দিকে চেয়ে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় বাবা। এদিকে বয়সও বাড়ছে। সংসার করতে হবে না তোকে ? এভাবে আর কতদিন ছন্নছাড়া থাকবি বল্‌তো ? বুবু দুলাভাই বেঁচে থাকলে আমাকে এত ভাবতে হত না - একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে খালার বুক চিরে।

হাসালে খালা। তুমি যদি মেয়ের মা হতে তাহলে জেনেশুনে একটি আতুরের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারতে? আমার হাতে যে অনেক কাজ পড়ে আছে খালা - দেশের জন্য, সমাজের জন্য। শুধু দু'আ কর যাতে অবশিষ্ট কাজগুলো করে যেতে পারি...।

তোর মুখে শুধু দেশ আর দেশ। দেশ তোকে কি দিল ? তোর সাথে আর কথায় পারিনে বাবা... চোখ মুছতে মুছতে খালি গ্লাস নিয়ে অদৃশ্য হন খালা।

সকাল ছ'টার দিকে বেরিয়ে পড়ে শাহেদ। সুলতানপুর গ্রামের বিস্তীর্ণ ধানী জমি পেরিয়ে তার পৈত্রিক নিবাস বাড়শ্রী গ্রামের পাশ দিয়ে একমাইলের মত হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়ালেই বাসে মিটফোর্ড হাসপাতাল মাত্র দুঘন্টার পথ।

পৈতৃক ভিটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল শাহেদ। পঁচিশ বছর পূর্বে বাড়িটি পুড়িয়ে দিয়েছিল পাক সেনারা। কয়েকটি পুড়ো পিলার এখনো দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়াতে স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় তার বাপ, মা ও ছোট ভাইবোন শিরিন ও মাজেদকে ঘরবন্দী করে পুড়িয়ে মেরেছিল ওরা। বাড়ির সামনের বড় পুকুরটা পেরোলেই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সদানন্দ বাবুর বাড়ি। ওনার একমাত্র মেয়ে জানকি ছিল তার ছোটবোন শিরিনের ক্লাসমেট। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ওরা ছিল দুজন। শাহেদ তখন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। একই রাতে জানকির পিতা-মাতাকে হত্যা করে জানকিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল নরপশুরা। সেই হতে জানকির আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায়নি।

জানকিকে আজ ভীষণ মনে পড়ছে শাহেদের। ওদের বাগানে ফুটতো প্রচুর রক্তগোলাপ। প্রতিদিন সকালে একগুচ্ছ টাটকা গোলাপ নিয়ে হাজির হতো সে। গানের গলা ছিল তার অদ্ভুত। সদানন্দবাবু একমাত্র মেয়েকে গড়তে চেয়েছিলেন মনের মত করে। কি গানে, কি লেখাপড়ায় ! দুজন প্রাইভেট টিউটর লাগাই থাকত জানকির জন্য।

দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে শাহেদ। সাতটার বাস ধরতেই হবে। সৌদিতে তার প্লাস্টিকের হাত দিয়ে এসেছে। এ সুযোগ তাকে নিতেই হবে। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সহযোগিতায় তার নাম এক নম্বরে আছে। প্লাস্টিকের হাত হলে কব্জি পর্যন্ত সার্টের হাত মুড়ে নিলে মোটামুটি খারাপ লাগে না। কিন্তু হাত না থাকলে ফুল সার্টের হাত বাতাসের তালে তালে নাচার দৃশ্য নিষ্ঠুর ঠাট্টার মত মনে হয়।

www.pathagar.com

অপেক্ষমান শাহেদ বাস আসা মাত্রই উঠে পড়ে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কালিগঞ্জ সেতুর কাছে এসে পড়ে বাসটি। মহাকালের সাক্ষী হয়ে সেতুটি দাঁড়িয়ে আছে এর সাথে জড়িয়ে আছে শাহেদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। জানালাপথে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে। নদীর বুক চিরে ভেসে যাচ্ছে কত শত নৌকা। এই সেতুর কাছাকাছি শাহেদ হারিয়েছিল তার ডান হাতটা। হাতের হাড়টি নিশ্চয়ই মাটির নিচে এতদিনে ফসিল হয়ে গেছে। নদী তীরে পড়ে থাকা সাকেরের লাশ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্রিজের লোহার খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিল নরপশুরা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ফিরে এসে সে তারের সাথে লটকানো সাকেরের কংকাল নিজের হাতে কবরস্থ করেছিল।

মনে পড়ে সে রাতের কথা। রাতের অন্ধকার ভেদ করে পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা দু'জন। গুরু গুরু শব্দে আকাশের বুক চিরে তখনো বিজলী চমকাচ্ছে। চারদিকে ঝড়ো হাওয়া। মুক্তিযুদ্ধের চরম মুহূর্ত। কোথাও জনমানুষের চিহ্ন বর্ণটি নেই। রাতের অন্ধকারে একমাত্র হানাদার বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের এসাইনম্যান্ট অনুযায়ী চলাফেরা করে। ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা সামলাতে সামলাতে ওরা দু'জন শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছে নির্দিষ্ট জায়গায়। এখান হতে শুরু হবে অপারেশন। রাত পোহাবার আগেই কাজ সিদ্ধ করে পৌঁছতে হবে ক্যাম্পে। হেড কোয়ার্টারে অপেক্ষমান ফলোআপ কমিটি বসে আছে মিশন সফল সংবাদের প্রতীক্ষায়। বিদ্যুতের আলোয় বয়ে চলা নদীটিকে মনে হচ্ছে দীর্ঘ এক সরীসৃপের মত। একশো মিটার দুরে কালিগঞ্জ সেতুটি অপেক্ষা করছিল এক মহাপ্রলয়ের। সেতুর দু'পাশে হানাদার বাহিনীর বাঙ্কার।

কাঁধ হতে ভারি টি,এন,টি-র বাক্সটি নামায় দু'জন। যা রসদ আছে তা দিয়ে এ ধরনের দুটো সেতু উড়ানো যাবে মুহূর্তে। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে নদীর কূল ঘেষে এগুতে থাকে দু'জন। রাত দুটোর পূর্বে টি,এন,টি-র বাক্সটি সেতুটির পিলারে বেঁধে রেখে আসতে হবে নির্দিষ্ট জায়গায়। তারপর সংকেত বাতি ক্রমান্বয়ে জ্বলে উঠবে একমাইল ভাটি হতে অপেক্ষমান দলের অন্যান্য তিনজন হতে। তিন নম্বর সংকেত পাওয়া মাত্র রিমোর্ট কন্ট্রোল সুইচে টিপ দিলেই বিকট শব্দে তূলোর মত উড়ে যাবে সেতুটি এবং তৎসংলগ্ন বাঙ্কারের শত্রু সেনারা।

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কনুই এবং হাঁটুর উপর ভর করে একসময় দু'জন সেতুর কাছে এসে নদীপাড়ের কাঁশবনে কিছুক্ষণের জন্য জিরিয়ে নেয়। লক্ষ্যস্থানের দিকে দু'জন এঁকেবেঁকে এগিয়ে যায় টিকটিকির মত। অতি সন্তপর্ণে ওরা নেমে আসে কোমর পানিতে। সেতু সংলগ্ন বাঙ্কার হতে আকস্মিক গুলির আওয়াজ শুনে দু'জন দু'দিকে পজিশন নেয়। কোমর হতে একটি করে হ্যান্ড গ্রেনেড মুখের কাছে নিয়ে দাঁত দিয়ে পিনে চেপে ধরে। চারটি গ্রেনেডের মধ্যে প্রয়োজনে তিনটি ব্যবহার করতে হবে শত্রু নিপাত করতে, আর অবশিষ্ট একটি আত্মসমর্পণ না করে নিজেদের উড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হিসাবে। কিন্তু না, আর গুলি হয়নি। শত্রুরা সতর্কতামূলক ফাঁকা গুলি হয়তো ছুঁড়েছে। অতি সাবধানে এবারে ওরা এগিয়ে যায় সেতুর পিলার বরাবর। দু'মিনিট প্রতীক্ষার পর পিলারের কাছে একজন আরেকজনের কাঁধে উঠে। নিচের জন আস্তে করে টি,এন,টি-র বাক্সটি এগিয়ে দেয়। পিলার

www.pathagar.com

ভীম হতে বেরিয়ে আসা রডে শক্ত করে বাক্সটি বেঁধে উপরের জন সাথীর কাঁধের উপর ভর করে আস্তে আস্তে নেমে আসে। নদীর কূলে উঠার প্রস্তুতি নিতেই আকস্মিক টর্চ লাইটের তীব্র আলো তাদের দুজনের চোখ ঝলসে দেয়। গুরুগম্ভীর আদেশ - হ্যান্ডস্ আপ...।

সাকেরের হাত মুহূর্তে কোমরে বাঁধা হ্যান্ডগ্রেনেডকে স্পর্শ করা মাত্রই শো করে একটি বুলেট ওর বক্ষ ভেদ করে চলে যায়। ধপাশ করে একটি ভারি দেহ নদীবক্ষে লুটিয়ে পড়ে। চোখের পলকে নদীবক্ষে ঝাপ দেয়ার পুর্বেই শাহেদের হাতের কনুইতে এসে লাগে দ্বিতীয় বুলেট। ভেসে আসা কচুরিপানা মাথায় দিয়ে ভাসতে ভাসতে নদীর ওপারে এসে পৌঁছে শাহেদ। উঠতে গিয়ে এই প্রথমে অনুভব করে ডান হাতটি কনুইয়ের সামান্য চামড়ার সাথে ঝুলে আছে। প্রচুর রক্তক্ষরণে শরীরটা অবশ হয়ে আসছে। কোনরকম নদীপারে পৌঁছে প্রাণপণে দৌড়াতে থাকে দলের অন্যান্যদের অবস্থানকে লক্ষ্য করে। বা হাতে পকেট হতে ছোট্ট চাকুটি বের করে ঝুলে থাকা হাতটি কেটে দেয়। প্রায় পঞ্চাশ মিটার দুরে প্রথম সংকেত বাতি জ্বলে উঠে আকাশের গায়ে।

অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠে শাহেদ - রহিম ভাই! লালা ভাই! আর পারছিনা, আমাকে ধরো। সাকের নেই। আমিও হয়তো কিছুক্ষণের জন্য আছি। এক আর্ত চিৎকারের মধ্য দিয়ে জ্ঞান হারায় শাহেদ।

কেমন করে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে এই পুনা হাসপাতালের বেডে এসে পৌঁছল তা আজও জানতে পারেনি শাহেদ। তিনদিন পর জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখতে পেল কনুই পর্যন্ত প্লাস্টিকের হাত লাগানো। দীর্ঘ চারমাস হাসপাতালে থেকে একসময় ছাড়পত্র পায়। একাত্তরের ১৩ই ডিসেম্বর অনেক শরণার্থীর সাথে সীমান্ত অতিক্রম করে মাতৃভুমিতে পা রাখে সে।

১৬ই ডিসেম্বর,'৭১ সাল। দেশ শত্রুমুক্ত। পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করেছে। শাহেদ ফিরে আসে নিজ গ্রামে। স্থানীয় হাইস্কুলে বিশেষ অনুষ্ঠান ডেকে তাকে বীরের মর্যাদা দিয়ে বরণ করে নেয় গ্রামবাসী। জাতীয় পরিষদ সদস্য হাফেজ পাটোয়ারী উদাত্ত কণ্ঠে বলেন - ভাইসব, আপনাদের সামনে আজ এ শুভক্ষণে যাকে দেখতে পাচ্ছেন সে এই গ্রামেরই কৃতীসন্তান। একজন আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধা। দেশকে বাঁচাতে গিয়ে পিতামাতা, ভাইবোন, এমনকি নিজের হাত পর্যন্ত হারিয়েছে। তার মত মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের ফলশ্রুতিতে আমরা পেয়েছি প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। আমরা কি সারাজীবন ওকে তুলে রাখতে পারি না আমাদের মাথায় ? আমাদের শাহেদ হাত হারিয়েছে সত্য, কিন্তু দেখিয়েছে দেশপ্রেম আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

হাজার হাজার গ্রামবাসীর করতালীর মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল সভার কাজ। শাহেদকে কাঁধে তুলে গ্রামবাসীরা সমস্ত বাজার ঘুরিয়ে এনেছিল সেদিন। সব হারানোর বেদনার মাঝেও সেদিন শাহেদ খুঁজে পেয়েছিল এক অপূর্ব প্রশান্তি। বুকখানা গর্বে ফুলে উঠেছিল তার। যে মাটির ঘাসপাতায় গড়াগড়ি খেয়ে সে বড় হয়েছে সে মাটিকে মুক্ত করতে গিয়েই তাকে হারাতে হয়েছে অনেক, কিন্তু সে হেরে যায় নি। প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে সে প্রমাণ করেছে দেশ মাতৃকার সে একজন সুযোগ্য সন্তান।

এরপরের ঘটনা অত্যন্ত দুর্বিসহ। শাহেদের চোখের সামনে কত লোকের ভাগ্য বিবর্তন ঘটেছে, রচিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি। হাফেজ পাটোয়ারী প্রতিমন্ত্রী হলেন। সম্মানজনক উপায়ে বেঁচে থাকার জন্য শাহেদ সরকারি প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারির জন্য হাফেজ পাটোয়ারীর স্মরণাপন্ন হতে গিয়ে দারোয়ানের গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছিল নিরাশ হয়ে। যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের নয়মাস লুটের টাকা দিয়ে পরদেশে ফুর্তি করে কাটিয়েছে

www.pathagar.com

তাদের অনেকেই পেয়েছে মুক্তিযোদ্ধের বড় বড় সনদ, সরকারি বড় বড় পদ।

সে স্বাধীনতার চেতনা দেখেছে, লাখো মানুষের চোখের গভীরে মুক্তি কামনা দেখেছে, স্বাধীনতার জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে অকাতরে প্রাণ দিতে দেখেছে আবার এটাও দেখেছে কিভাবে দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ প্রতিবেশী দেশে পাচার হয়েছে ! দেশের ধ্বজাধারীরা স্বাধীনতার সুফল নিয়ে কিভাবে নিজেদের ভাগ্য গড়েছে !

অত্যাচার, অনাচার আর ভুখানাঙ্গা মানুষের আহাজারী, কুকুর এবং মানুষের সহবস্থান, একমুঠো ভাতের জন্য যুবতী মেয়ের নির্দিধায় দেহ দান - এসমস্ত দেখে দেখে শাহেদের মন যখন তীব্র দহনে জ্বলছিল তখনই এক বন্ধুর সহায়তায় সে সৌদিতে যায়। অভিশপ্ত হাতের জন্য কয়েকটি চাকরির অফার পেয়েও করতে না পারার ব্যথা নিয়ে বাধ্য হয়ে ফেরীওয়ালা সেজে রুজির পথ বেঁছে নিয়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হলনা।

বাস কন্ডাক্টরের ডাকে সম্বিত ফিরে পায় শাহেদ। নেমে পড়ে হাসপাতালের সামনের বড় রাস্তার মোড়ে। সকাল ন'টায় রিসিপশনে কাগজ দাখিলের কথা। এমনিতেই আধঘন্টা দেরি হয়ে গেছে।

পকেট হতে বামহাতে এ্যাপয়েন্টম্যান্ট লেটার বের করে রিসিপশন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায় শাহেদ।

কিছুক্ষণের মধ্যে শাহেদের ডাক পড়ে। অপারেশন থিয়েটারের দিকে অগ্রসরমান শাহেদের হৃৎপিণ্ড আশা নিরাশার দোলায় দুলে উঠে। জার্মানি প্লাস্টিক সার্জনদের উপর তার আস্থা অনেক। ওরাই প্লাস্টিক সার্জারির জন্মদাতা। নিশ্চয়ই হাতখানাকে দেখতে অরিজিনেল মনে হবে। এক অজানা আবেগে দোল খায় তার দেহমন।

এক সপ্তাহ হাসপাতাল বেডে অবস্থানের পর আজ শাহেদের ছুটি নেয়ার পালা। ডান হাতের কনুইয়ের সাথে পুনরায় প্লাস্টিকের হাত জুড়ে দেয়া হয়েছে। দেখে বুঝাই যায় না এটা নকল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নকল হাতখানাকে দেখে শাহেদ। খালা নিশ্চয়ই দেখে খুশি হবেন। তবে বিয়ের জন্য যে উঠেপড়ে লেগে যাবেন এটা সুনিশ্চিত। হাসি পায় শাহেদের। বিয়ে দিতে পারলেই যেন খালার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার পাবে।

আকস্মিক তন্ময়তা কেটে যায় শাহেদের কারো পদশব্দে। ভূত দেখার মতই চমকে উঠে। একি সম্ভব ? ভুল দেখছি নাতো ? নাকি স্মৃতি রোমন্থন তাকে হিপনোটাইজম করেছে? সেই সরল মুখের উপর ভাসছে ডাগর ডাগর চোখ। একরাশ কালো চুলের গভীরে ক্লিপআঁটা নার্সের সাদা বেল্ট। ভাষাহীন শাহেদ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে আগন্তুকের দিকে।

অপর প্রান্ত হতে একই অভিব্যক্তি ! বোবার দৃষ্টি নিয়ে দুজন এক অপরের পানে অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে। ভাষার পাখি যেন বোবা হয়ে ওড়াল মেরেছে বিস্তৃত মহাশূন্যে।

নার্সের হাত হতে খসে পড়ে ওষুধের বোতল। গোলাপী রংয়ের ওষুধ মেঝেতে গোলাপী রং ছড়ায়।

তুমি এখানে ? ভুল দেখছিনাতো ? বিড় বিড় করে বলে উঠে শাহেদ।

শাহেদভাই তুমি না মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলে ? তাহলে কি আমি ভুল শুনেছিলাম?

শহীদ হলে কি এখানে দেখতে পেতে ? তবে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিল আমার এ ডান হাতটা।

এতদিন কোথায় ছিলে ?

বাংলার বুকে ভুখানাঙ্গা মানুষের মিছিল এবং সীমাহীন অন্যায় অবিচার সহ্য না করতে পেরে দশ বছর আগে চলে যাই সৌদিতে। অক্ষমতার জন্য ধরা পড়ে ফিরে আসি দেশে। আর এখন তোমার সামনে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি প্লাস্টিকের হাত নিয়ে। তবে

www.pathagar.com

জানতে পারি এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ?

শাহেদ ভাই! আমি জানকীর প্রেতাত্মা। জানকী কবে মরে গেছে সে দিন যেদিন নরপশুরা আমার সামনে আমার বাবা মাকে হত্যা করে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিল তাদের বাঙ্কারে। ওখানে আমাকে চারমাস ওরা পুষে রেখেছিল নিজেদের প্রয়োজনে। মৃত্যু কামনা করেছি বার বার, কিন্তু আমাকে মরতে দেয়নি ওরা। একটানা চারমাস বাঙ্কারে বন্দী জীবন কাটানোর পর হঠাৎ একদিন সকালে শুনতে পেলাম হাজার হাজার মানুষের বিজয়োল্লাস। বাঙ্কার হতে কোনরকমে উঠে যখন দেখলাম কাছে কেউ নেই, মৃত্যুর প্রচন্ড সুযোগ আমার দুয়ারে উপস্থিত তখনই দৌড়ে নদীতে ঝাপ দিয়েছি - আর কিছুই মনে নেই।

জ্ঞান ফিরতেই দেখি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এসে আমাকে 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করলেন এবং সাথে সাথে হাসপাতালের চাকরিটাও পেয়ে গেলাম। আর্তের সেবায় জীবনটা কাটিয়ে দেয়ার জন্য যেন নতুন করে জন্ম নিলাম। সে হতে আজও আছি।

বিয়ে করো নি ?

বিয়ে ? আমার মত অস্পৃশ্যাকে কে বিয়ে করবে শুনি? আর কেনই বা বিয়ে করতে যাব ? বললামতো তোমাদের সেই জানকীর মৃত্যু হয়ে গেছে আজ হতে পঁচিশ বছর পূর্বে। আমার কোন পরিচয় নেই, ধর্ম নেই। জানকীর এই দেহমন শুধু রোগীদের তরে নিবেদিত। একটু অন্যমনস্ক হয়ে জানকী বলে, এতক্ষণ শুধু নিজের কথাই বললাম স্বার্থপরের মত। তোমার ব্যাপারে কিছুই জানা হয়নি - তোমার বউ অর্থাৎ ভাবি কোথায় ?

- ভাবি ? সেতো সুস্থ মানুষের জন্য। আতুরের কাছে কে মেয়ে বিয়ে দেবে বল ?

- বিয়ে করো নি কেন? তুমিতো আর আমার মত নও। সমাজ তোমাকে মাথায় তুলে রেখেছে।

- জানকি! জীবনের সূর্য অস্তমিত হওয়ার আরতো বেশি দেরি নেই। তার চেয়ে এই ভাল, যে চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম সে চেতনা বুকে পোষণ করে কিছু মানুষ গড়ি ?

শাহেদের কথা শুনে জানকীর চোখ বেয়ে নেমে আসে প্রবল অশ্রুধারা। এ অশ্রুতো অনেক আগেই শুকিয়ে গিয়েছিল, আজ তবে এমন হল কেন ? চোখ মুছতে গিয়ে চোখের প্লাবন থামাতে পারে না জানকী। অশান্ত ঢেউয়ের মত তা আছড়ে পড়ে চোখের দুকূল জুড়ে।

জানকী! তুমি কাঁদছ ? কেন, কোন্ দুঃখে ? শাহেদ জানকীর মৌনতা ভাঙ্গার প্রয়াস খুঁজে।

তোমাকে আজ দেশের বড়ই প্রয়োজন শাহেদ ভাই। ভাবছি, আমার জীবনের বিনিময়ে বিধাতা যদি তোমার এ হাতটি ফিরিয়ে দিতেন তাহলে আমার মত সুখী আর কেউ হতো না।

কিছুক্ষণ জানকির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শাহেদ। পরক্ষণেই প্রসঙ্গ পালটিয়ে

www.pathagar.com

বলে উঠে, দ্যাখো হাসপাতালের বাগানে কত গোলাপ ফুটেছে। ওরাতো সুন্দরের জন্য ফুটে, তাই না ? মনে পড়ে তোমার পঁচিশ বছর আগের কথা ? তোমাদের বাগানে প্রচুর রক্তগোলাপ ফুটতো। প্রতিদিন সকালে টকটকে লাল এক সাজি ফুল আমার পড়ার টেবিলে রেখে যেতে, কি মনে নেই ?

আছে। তুমি না গোলাপ খুবই ভালবাসতে?

শুধু ফুল নয়, যে ফুল ছুঁড়ে হাসতে হাসতে পালিয়ে যেত তার চলার ছন্দকেও কি কম? যাক সে কথা .. সে দিনগুলো তো কবে বাসী হয়ে গেছে, তাই না ? ...একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে শাহেদের বুকের গভীর হতে।

তাই নাকি ? গোলাপ যে দিয়ে যেত সে কেন সাতসকালে তোমাকে স্মরণ করত তা কোনদিন জিজ্ঞেস করেছিলে ? আর স্মৃতি কোনদিন বাসী হয় না। এমনও কিছু স্মৃতি আছে যা জীবনভর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করে। তুমি আমার কাছে এ ধরনেরই একটি স্মৃতি শাহেদ ভাই।

ঠিকই বলেছ জানকী। সেই টাটকা গোলাপের মত তুমিও আমার স্মৃতিতে অদ্যাবধি সুগন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছ - এতটুকু ম্লান হওনি। জীবনের মধ্যাকাশে দাঁড়িয়ে আজও সেই স্মৃতি আমাকে সময় সময় কাঁদায়। এ স্মৃতিগুলো যেন খোদিত হয়ে আছে হৃদয়ের ঝকঝকে মার্বেলে - একে মুছে ফেলার সাধ্যি কোথায় ?

কেন এমন হল শাহেদ ভাই ? কি সেই পাপে আমার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল ? সেই কবে তোমার জন্য সাতসকালে একগুচ্ছ গোলাপ তুলে তোমার পায়ে নীরবে পূজো দিয়ে আসতাম। মনটা তখন ছিল টাটকা গোলাপের মতই সুন্দর, আর আজ যে জানকী তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সেতো শুকনো ডালে পাপড়ি ঝরা গোলাপের কান্না - দু'হাতে মুখ ঢাকে জানকি। ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে থাকে।

শাহেদ এগিয়ে এসে জানকীর মাথা উঁচু করে ধরে বলে, জানো, হাসপাতালে আসার প্রাক্কালে যখন তোমাদের বাড়ি অতিক্রম করছিলাম তখন তোমার কথা মনে করে খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। কি অদ্ভূত যোগাযোগ !

আর আজ সকালে আমাকে এ ওয়ার্ডে বদলি করা হল - সে কি তোমার সাথে দেখা হবে বলে ? অশ্রুসিক্ত জানকী অস্পষ্ট ভাষায় বলে উঠে।

জানি না জানকি, জানি না। এ পৃথিবীতে এক্ষণ অনেক কিছুই ঘটে যায় যা, মানুষ পূর্বে কখনো জানে না, জানো - আমার হাতে প্রচণ্ড শক্তি পাচ্ছি এ মুহূর্তে। মাসখানেক যাবত স্কুলের সেক্রেটারি পিছনে গেলে আছেন। দেরি করছিলাম শুধু এ হাতটার জন্য। ভাবছি জয়েন করব। দেশের জন্য উত্তরসূরিদের মধ্যে কিছু দেশপ্রেমিক সৃষ্টি করতে হবে। দেশে ফেরার পর এটির বড় অভাব অনুভব করছি। যাবে জানকি ? যাবে আমার সাথে ? আমাদের দুজনের মিলিত শক্তি দিয়ে কি পারবনা উভয়ের জীবনের ব্রতকে সত্যিকার রূপ দিতে?

শাহেদের চোখমুখে ফুটে উঠে এক সুগভীর আত্মপ্রত্যয়। এগিয়ে এসে জানকী শাহেদের

www.pathagar.com

ডান হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বলে, তোমার ডান হাত নেই, কিন্তু আমারতো রয়েছে। আমার এ হাতকে কাজে লাগাও শাহেদ তোমার যত্ত খুশি। একবার পরীক্ষা করে দেখো জানকীর এ হাত শাহেদের ডানহাতের প্রয়োজন মেটাতে পারে কিনা?..বাঁধভাঙ্গা কান্নার অবিরল ধারায় পুনর্বার সিক্ত হয় জানকীর গণ্ডদেশ।

জানকীর চোখের তারায় শাহেদ খুঁজে পায় এক স্বপ্নিল ভবিষ্যৎ। নীরবে ওর দীঘল কেশরাশিতে বিলি কেটে দিতে দিতে বলে - কলেজে পড়তে তোমার যে গানটি আমাকে একসময় বিভোর করে দিত, সে গানটি তোমার মনে আছে জানকি ? ঐ যে .."ক্লান্তি আমায় ক্ষমা কর প্রভু" ..।

অশ্রুসিক্ত জানকী শাহেদের বুকে মাথা রেখে গেয়ে উঠে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ মিশিয়ে ... ক্লান্তি আ-মা-য় ক্ষ-মা করো প্র-ভু .... পথে যদি ....।

শাহেদের বুকে ঢেউ খেলে যায় এক বিচিত্র অনুভূতির। যে অনুভূতি পূর্বে সে কখনো জানকীর কাছে প্রকাশ করতে পারেনি, আজ তা বহুকাল পরে এই নিভৃত পরিবেশে হৃদয় বীণায় সুরের গুঞ্জন ছড়াচ্ছে থেকে থেকে। পর্দার ফাঁক দিয়ে জানালার কাচ ভেদ করে তার চোখ দুটো হাসপাতালের পুষ্পিত গোলাপকুঞ্জে খুঁজতে থাকে পঁচিশ বছর আগের সেই চপলা, চঞ্চলা জানকির মুখের অবয়ব। প্রতিদিন ভোরে শিশিরসিক্ত একগুচ্ছ তাজা ফুল যে তাকে উপহার দিয়ে যেত। মন তার জানকীকে নিয়ে প্রজাপতির মত উড়তে থাকে কাঁটাঘন গোলাপকুঞ্জের ডালে ডালে।

* * *

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাদারীপীরের জটা

প্রবাসে একটানা এক বছর কাটানোর পর দেশে ছুটিতে এসে টুটুল ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার পূর্বেই তার এই নাদুস-নুদুস দেহখানা আক্রান্ত হবে কোন না কোন জটিল রোগে। রাজধানীর তাবত মশাগুলো দেয়ালে ও মশারীর ভাঁজে ভাঁজে যেন তারই প্রতীক্ষার প্রহর গুণে কখন সে বাসায় ফিরবে, আর একটানা রক্ত শোষণের কাজে মত্ত হবে। বাসার কারোর রক্তে যেন ওদের অভিরুচি নেই। হাসি পায় টুটুলের। মশাও মানুষ চেনে রুচি পাল্টায়।

স্বদেশে ছুটি কাটাতে এসে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করে টুটুল। যেখানে যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। অসংখ্য মানুষের ভারে নুয়ে পড়েছে সমগ্র দেশ। বিশেষ করে ঢাকা শহরকে মনে হয় মানুষের চিড়িয়াখানা। কানা, আতুড়, বোবা, ফকির, ধনী, গরীব বিভিন্ন ধরণের লোকজনে গিজগিজ করছে এ শহরের প্রতিটি অলিগলি। জীবিকার সন্ধানে মানুষ এখানে চরকার মত ঘুরছে। এদের সাথে তাল মিলিয়ে ছুটছে সাইকেল, রিক্সা, ঠেলাগাড়ি, স্কুটার, বাস, ট্রাক, লরি, ট্যাক্সি আরো কত বিচিত্র ধরণের যানবাহন। সমগ্র শহরের রাজপথ থেকে শুরু করে গিঞ্জি বস্তি পর্যন্ত নীল ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হয়ে নাকে মুখে কার্বন ছড়াচ্ছে নিরন্তর। এককালের বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলির এ শহরের ব্যস্ত নরনারীর সাথে যোগ দিয়েছে লেংড়া ও আধমরা একপাল কুকুর-বিড়াল। লাঠি পেটা, ঝাটা পেটা, আর রোদ, বৃষ্টি ও ঝড়ের ঝাপটা সামলাতে না পেরে তাদের কেউ কেউ হারিয়েছে নিজের অঙ্গ সৌষ্ঠবের মূল্যবান পশম সম্পদ। তবু বাঁচতে হবে বাঁচার তাগিদে। 'মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভূবনে'- এ সত্যটুকু ঢাকাবাসী ও পশুর ক্ষেত্রে যেন অধিক প্রযোজ্য। এ শহরের আকাশে ছড়ানো কালো ধোঁয়া ভেদ করে চাঁদ-তারার স্নিগ্ধ আলো কোনদিন মানুষগুলোকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছে কিনা সে তথ্য নেয়ার জন্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হয়তো একটা আলাদা গবেষণামূলক সেল থাকার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল প্রতিদিন কতটি মশা, মাছি মানুষের হাতে পিষ্ট হচ্ছে, কিংবা বিষাক্ত মশার ছোবলে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কতজন অকালে ঝড়ে পড়ছে তার হিসেব নেয়ার।

বিয়ের ফুল এবারও হয়তো ফুটবে না। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, জীবনের আরও একটি বসন্তের নিঃশব্দ পতন ঘটবে। গতবারও এমনি খোঁজাখুঁজির পালা শেষে ব্যর্থতা নিয়ে প্রবাসে ফিরে যেতে হয়েছিল। এবারে পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়-স্বজনরা একযোগে হন্যে হয়ে ক'নে খুঁজছে। মা-এর একটাই কথা, যদি এবারও আমার টুটুল ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় তাহলে সবাই আমার মরা মুখ দেখবে। কি কঠিন সমস্যা মাকে নিয়ে ! দুবছর পর বিয়ে হলে কি এমন ক্ষতি ? টুটুল ভেবে পায় না, মা এমন করে প্রতিজ্ঞা করে সবাইকে চিন্তাযুক্ত রেখেছেন কেন ?

গত পনরো বিশ দিনে কমপক্ষে দু'ডজন কনে দেখা হয়েছে। এদের মধ্যে কাউকে মায়ের পছন্দ হয়নি। কলেজে পড়ুয়া ছোট বোন নীলার অভিমত, কনে যখন মায়ের পছন্দ

www.pathagar.com

মতই হবে, তখন তিনি নিজে দেখলেই পারেন। আমাদেরকে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া কেন? মা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে বলেন, তারমানে এই নয় যে তোদের মর্জিমাফিক যেন তেন একটা প্রস্তাবকে মেনে নিতে হবে ? এটা কি ছেলেখেলা ? আমার ছেলে কম কিসে ? ইঞ্জিনিয়ার বানাতে ওর জন্যে কি কম কাঠখড়ি পোড়াতে হয়েছে ? ওর মত একটি ছেলে দেখাতো দেখি ? শুধু বক বক করতে শিখেছিস তোরা, যত্তসব অপদার্থের দল- হুঁ, কবে যে তোরা কাজের হবি ?

এদিকে ছুটির পালে হাওয়া লেগেছে। ফুরিয়ে আসছে একমাসের পথ দেখতে দেখতে। টুটুল ভাবছে এবারেও কি মায়ের আশা অপূর্ণ থেকে যাবে ? কোথায় লুকিয়ে আছে তার মানসকন্যা ? কপালের লিখা অখন্ডনীয়, এ যদি সত্য হয় তাহলে ওকে খুঁজে পেতে এত দেরী হচ্ছে কেন ? যৌবনের মূল্যবান সময়টুকু শুধু কি খোঁজাখুঁজিতে কাটিয়ে দেবে সে ?

আনমনে হেঁটে যাচ্ছিল টুটুল মগবাজারের মোড়ের দিকে। মায়ের জন্যে কিছু ফলমূল ও দু-একটি বাংলা ম্যাগাজিন কিনে নেয় রাস্তার হকারদের কাছ থেকে। নাছোড়বান্দা সব হকাররা। কেমন করে যেন চিনে নিতে পারে তাদের আসল খরিদ্দার! মনোবিদ্যায় এই হকাররা একেকজন পন্ডিত বটে! একজনতো বলেই ফেলল, স্যার! বিদেশেতো প্রচুর ফলমূল খান কিন্তু দেশের টাটকা ফলমূলের স্বাদটা একবার যাচাই করেই দেখুন না। টুটুল আশ্চর্য হয়, কেমন করে একজন সাধারণ হকারের কাছে সে ধরা পড়ে গেল! তবে কি তার ব্যবহারে বা আচরণে প্রবাসী ভাবটা ফুটে উঠেছিল?

পেট্রোল ও মবিল পোড়া কালো ধোঁয়া চোখের ভেতর জ্বালা সৃষ্টি করে পানি ঝরাচ্ছে অবিরাম। নরম টিসুপেপার পকেট হতে বের করে চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়া শিশিরসদৃশ নোনাজল আলতোভাবে ঘসে নিয়ে রাস্তার পাশের পাকা বেঞ্চটিতে বসে পড়ে টুটুল। সদ্য কেনা বাংলা ম্যাগাজিনটি এবারে মেলে ধরে চোখের সামনে। রাজনৈতিক যত অস্থিরতা। সরকারী এবং বিরোধীদলের মধ্যে ক্ষমতার তীব্র লড়াই। ইসরাইলী সৈন্যের সাথে ফিলিস্তিনী যুবকদের সংঘাত, কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ান সাবমেরিন ও তার সকল ক্রুদের সলিল সমাধি, ঢাকার রাজপথে সন্ত্রাসী কর্তৃক যুবক গুলিবিদ্ধ, প্রেমিকের আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় যুবতী এসিডদগ্ধ - এ সবকিছুই বিরক্তিকর। ভাল কোন কাজ যেন এ জগতে হয় না। পৃথিবী নামক নিষ্পাপ গ্রহটি পাপের রাহুগ্রাসে নিপতিত। এ গ্রহের আকাশে শান্তিকপোত ডানা মেলে উড়তে গিয়ে বিদ্ধ হয় নিষ্ঠুর শিকারীর বিষাক্ত তীরের ফলকে। সমাধিকারের ভিত্তিতে বেঁচে থাকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ মানবজাতি নিজেকে নিয়ে এত বেসামাল কেন ? সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শুধুই কোন্দল আর সংঘাত। টুটুল ভেবে পায় না, মানুষের জন্যে সৃষ্ট একটি মাত্র পৃথিবী পাপের ভারে এত কলুষিত কেন ? সংঘাতময় পৃথিবীর মানুষগুলোর অপকর্ম মানুষই আবার প্রকাশ করে কাগজের পাতায়।

এবার চোখের দৃষ্টি এসে থামে একজন সর্পবিশারদের বিজ্ঞাপনে, 'সাপ মারবেন না, সাপ দেশ ও প্রকৃতির সম্পদ, সর্পবিদ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতে পারেন গ্যারান্টি সহকারে'! কি আশ্চর্যের ব্যাপার! সর্পবিদের নিজের সমস্যার সমাধান কে দেবে? পাশাপাশি আরেকজন মহিলার বিজ্ঞাপন । তিনিও একশো এক জাতের সমস্যার সমাধান

www.pathagar.com

দিতে পারেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে তিনি নাকি মনের মানুষটির সন্ধান কিংবা বান মেরে শত্রুকেও ধ্বংস করে দিতে পারেন! কি আশ্চর্য ! ঈশ্বরের কি দায় পড়েছে, শত্রুকে বান মেরে ধ্বংস করার জন্যে তিনি এক মহিলাকে প্রতিনিধি বানিয়ে এ ধরায় পাঠাবেন?

টুটুলের আগ্রহ বাড়তেই থাকে। সে দেখতে চায়, ঈশ্বর মনোনীত নারী প্রতিনিধিকে, যে ক্ষমতাবলে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করছে এ ধরায় তারই সমগোত্রীয় মানুষের! উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে রোগীকে ক্ষতিপূরণসহ টাকা ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাস অর্জনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এই মহিলা।

নেহায়েত কৌতূহলবশতঃ টুটুল ঠিকানানুযায়ী এগিয়ে যায় সরু একটি গলিপথ ধরে। বিধাতার মহিলা প্রতিনিধির কাছে গিয়ে বলবে, তুমি তো অঘটনঘটনপটিয়সী। আমার মায়ের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দাও মনের মানুষটির সন্ধান দিয়ে। মন্দ কি! জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হবে নূতন আরেক অধ্যায়। পত্রিকার পাতায় এ ধরণের বিজ্ঞাপন জীবনে সে বহুবার দেখেছে, কিন্তু তলিয়ে দেখেনি কোনদিন। এ ধরণের নিছক মিথ্যা আশ্বাস তার বিশ্বাসের শক্ত শিকড়কে কোনদিন নড়াতে পারেনি। পরিবর্তে পত্রিকাওয়ালাদের ওপর ভীষণ রাগ ধরেছে তার। বিজ্ঞাপনের কয়েকটি টাকার লোভে ওরা সমাজের কিছু সংখ্যক সহজ সরল মানুষগুলোকে একপাল ভণ্ডের কাছে লেলিয়ে দিচ্ছে অবলীলায়।

প্রায় আধমাইল হাঁটার পর ডানদিকের বাঁকা রাস্তার মোড়ে লাল সাইনবোর্ডে বড় করে লেখা, 'সামনে মাদারীপীরের আস্তানা, এগিয়ে যান'। টুটুলের আগে পিছে আরও কয়েকজন উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে সাইনবোর্ডের নির্দেশ মেনে এগিয়ে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে ফিস ফিস আওয়াজ। টুটুল লক্ষ্য করে তার সামনেই এক বৃদ্ধ বোরকা পরিহিতা বিশ পঁচিশ বছরের এক যুবতীর কানের কাছে ফিস ফিস করে কোন এক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে ফিস ফিস আওয়াজ। যুবতীর ভীত সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ। কেউ যেন দেখে না ফেলে তার জন্যে বোরকার নেকাবে ঢাকা মুখাবয়ব। গলিপথ ধরে আনুমানিক পোয়ামাইল রাস্তা অতিক্রম করার পর মূল রাস্তাটি পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে গেছে সামনে। দিক নির্দেশনার সব কটিতেই লেখ - মাদারীপীরের আস্তানা, সামনে বাড়ুন। কোনদিকে যাবে টুটুল ? সকলের চোখে মুখে একই প্রশ্ন ? সবুজ চাদর পরিহিত একরাশ দাড়িভর্তি জটাধারী সন্যাসী শ্রেণীর এক লোক পাশের ছোট্ট একটি খুপরী হতে বেরিয়ে এসে প্রত্যেকের সমস্যা জেনে নিয়ে একেকজনকে একেক রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। তারই নির্দেশমত টুটুলও মোহগ্রস্তের মত কোন কথা না বলে এগিয়ে যায়। পাকা সরু রাস্তার দুপ্বপাশে ছেঁটে দেওয়া ঘন কাঁটাবনের সারি। নীরব, নিস্তব্ধ পরিবেশ।

শহরের উপকণ্ঠে এ এলাকাটি মহানগরীর কোন ব্যস্ততাকে স্পর্শ করে না। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই টুটুল লক্ষ্য করে তার সামনে রাস্তার দুপাশে কাঁটাবনের উপরে একরাশ পিঙ্গল জটাচুলধারী মূর্তির মাথাকে বাঁশের খুঁটির সাথে এঁটে দেয়া হয়েছে, দেখতে অনেকটা সবজী ক্ষেতের বাগানে কাক-তাড়ুয়ার প্রতিকৃতি। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ মাদারী গাছ। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে অজস্র লাল ফুল। প্রত্যেক ডালে

www.pathagar.com

ডালে লটকে আছে চূলের মত লম্বা লম্বা একধরণের শুষ্ক কালো বর্ণের লতা। মনে হয় দীঘলকেশী যৌবন উম্মাদনায় ভরা কোন তরুণীর এলোকেশ দিয়ে সাজানো হয়েছে মাদারী গাছের অঙ্গ সৌষ্ঠব।

টুটুলের মনে পড়ে ছোট্টবেলার কথা। পিতার কর্মস্থল মফস্বল শহরে তখন সে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র। তাদের বাসার ঠিক সামনে ছিল অসংখ্য মাদারী গাছ। কাঁটাযুক্ত এ গাছগুলোতে বছরের কয়েকটি মাস জুড়ে এমনি লাল লাল ফুলে ছেয়ে থাকতো। সকালের মিষ্টি রোদে ডালে ডালে বুলবুলি আর ধানশালিকেরা কিচির মিচির করতো। বাসার পাশেই বাঁশের বেড়ার ছোট্ট খুপরির মধ্যে থাকতো রাবী নামের মধ্যবয়সী রমণী। মায়ের সাথে ঝগড়া করে ছোটবেলায় নাকি নিখোঁজ হয়েছিল। আর কোনদিন ফেরেনি। কেমন করে ওর সংসার চলতো কেউ তা জানে না।

খুপরীর বাঁশের দরজায় তালা লাগিয়ে রাবী কখনো কখনো উধাও হয়ে যেত, পনরো বিশদিন পর আকস্মিকভাবে ফিরেও আসতো। টুটুলদের বাসার সামনের মাদারী গাছগুলোর ফুলগুলো ঝরে এক সময় যখন ডালে ডালে কালো চুলের মত শুষ্ক লতাগুলো ঝুলে থাকতো তখন রাবী পাড়ার ছেলেদেরকে সাবধান করে বলতো, দ্যাখো ছেলেরা - ভুলেও যেন মাদারী গাছ হতে লতাগুলো ছিঁড়তে যেয়ো না। মাদারীপীর কিছুদিনের মধ্যে তাঁর পছন্দের এ লতাগুলো নিতে আসবেন তোমাদের অলক্ষ্যে, ঠিক সময়মত তোমরা তা দেখতে পাবে।

সত্যিই একদিন ঘুম হতে সকালে উঠে টুটুল দেখে, তাদের মাদারী গাছগুলোতে ঝুলে থাকা চুলসদৃশ লতাগুলো কে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেছে! রাবী মাদারীপীরের ভীষণ ভক্ত। মাদারীপীর কখন দেখা দেবেন একমাত্র রাবী-ই জানে। মাঘি পূর্ণিমার এক রাতে টুটুলের সহপাঠিরা রাবীর খুপরীর পেছনের নারিকেল গাছ হতে নারিকেল চুরি করতে গিয়ে ওর ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে লম্বা দাঁড়িওয়ালা জটাধারী এক বৃদ্ধকে চোখ মুদা অবস্থায় নিজেদের চোখে দেখেছে। পাড়ার ছেলেরা যখন এ কথাটা ফাঁস করে দিল, সে হতে রাবীর সাথে একটু সমীহ্ করে কথা বলতে শুরু করলেন পাড়ার সব মহিলারা।

কারোর কাছে হাত পাততে রাবীকে কখনো দেখা যায়নি। অথচ জীবিকার সন্ধানে কোন কাজকর্ম করতেও তাকে কেউ কখনো দেখেনি। কেমন করে অর সংসার চলে এ কথাটি জানার কৌতূহল অনেকের থাকলেও কেউ তাকে জিজ্ঞেস করতে কোনদিন সাহস করেনি। রাবীর মুখের মধ্যে যে ঝগড়াটে ভাব পরিস্ফুটিত হয়ে উঠতো, হয়তো জিজ্ঞাসা না করার পেছনে এও একটা কারণ ছিল। মাদারীপীরের কথা শুনে শুনে একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মা! মাদারী পীর দেখতে কেমন ? মা হেসে বললেন, কেন, রাবী তোকে বলেনি ? ঐ একমাত্র রাবী ছাড়া মাদারী পীরকে কেউ কোনদিন দেখেনি। তোরা ওর কথা বিশ্বাস করিস কেন ?

আকস্মিকভাবে একদিন দেখা গেল রাবীর মাথার চুলগুলো পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে জটাযুক্ত হয়ে গেছে। চুলগুলো শক্ত পাথরের মত দুভাগ হয়ে পেছনে এলিয়ে পড়েছে। ফুলা ফুলা চোখ, আর জটা চুল ওকে যেন এক রহস্যময়ী নারীতে রূপান্তরিত করেছে। রাত বারোটার পর পাড়ার রাস্তায় রাস্তায় রাবী আনমনে গান গেয়ে বেড়াতো, হায়রে মাদারী, তুমি

www.pathagar.com

আমার হও কান্ডারী; তোমার রূপে আমি হলেম বৈরাগী, রে মাদারী, অভাগীর হও কান্ডারী।

রাবী বোধ হয় বড্ড উম্মাদ হয়ে গেছে। কিছু জিজ্ঞেস করলে হয়তো কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে, সে সন্দেহে রাবীকে কেউ কিছু বলে না অথবা বলার সাহস করে না। একদিন রাবী নিরুদ্দেশ হলো। পাড়ার ছেলেরা ওকে অনেকদিন না দেখে একদিন ওর আঙ্গিনার পেয়ারা গাছ হতে পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে যেই না গাছে উঠতে যাচ্ছিল অমনি চারপাঁচ হাত লম্বা এক অজগর রাবীর খুপরী হতে বেরিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে তাদেরই সম্মুখ দিয়ে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল, সে হতে ওদিকে পা মাড়াবার সাহস কেউ করেনি।

বর্ষণমুখর এক রাতে ঝড়ের ছোবল সহ্য করতে না পেরে রাবীর বাঁশ বেতের তৈরী খুপরীটি মাটির সাথে মিশে গেল। বৃষ্টিতে পঁচে যাওয়া বাঁশের চালা ভেদ করে কিছুদিনের মধ্যে গজে উঠা মাদারী গাছটি বেশ শাখা প্রশাখা মেলে দিয়েছে দেখতে দেখতে। পাড়ার বৌ-ঝিরা পাশের পুকুর পাড়ে বাসন ধুতে গিয়ে পূর্ণিমার স্বচ্ছ চাঁদের আলোয় অজগরটিকে গাছের ডালে ঝুলে থাকতে দেখেছে। বৃদ্ধরা দুষ্ট ছেলেদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন, কেউ যেন অজগরটিকে লক্ষ্য করে ঢিল না ছোঁড়ে। কারণ সাপটি নাকি পাড়ার রাখাল। পাড়ার রাখালেরা নাকি মানুষদেরকে অমঙ্গল হতে রক্ষা করে। শোনা যায়, এ উপদেশ না মেনে ষোল বছরের পাড়ার ছেলে পিন্টু একদিন সাপটিকে লক্ষ্য করে ঢিল মেরেছিল। বাসায় ফেরা মাত্রই তার অস্বাভাবিক জ্বর এলো। জ্বরের প্রকোপ সহ্য করতে না পেরে সকালের দিকে পিন্টুকে এ ধরা হতে চিরবিদায় নিতে হয়েছিল। তাছাড়া একদিন এক সাপুড়ে সাপটিকে ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে তাড়া খেয়ে যেইনা পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিল অমনি সে পানির নিচে তলিয়ে গেল। পরদিন তার ভেসে উঠা ফুলা লাশটি পুলিশ ময়না তদন্তের জন্যে উঠিয়ে নিয়েছিল। সে হতে সাপটিকে আর অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি বরং পাড়ার হিন্দু ঘরের বউ-ঝিরা পূর্ণিমার রাতে লক্ষীন্দরের নাম স্মরণ করতে করতে পরম ভক্তিভরে বাটি বাটি দুধ রেখে আসতো রাবীর পরিত্যাক্ত ঘরের আঙ্গিনায়। সকালে উঠে খালি বাটি নিয়ে আসতো বউ ঝি-রা অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম জানাতে জানাতে।

ছোটবেলার সে টুকরো টুকরো স্মৃতির পর্দা টুটে যায় টুটুলের কারো বিনম্র আহ্বানে। অনুগ্রহপূর্বক এ দরজা দিয়ে উপরে উঠুন। মাথায় দুভাগ হয়ে যাওয়া ঝাকড়া জটাধারী এক সন্যাসী ঈশারায় ওপরে উঠার সিড়ি দেখিয়ে দেয়। দোতালার সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে টুটুল দ্রুতপদে। আট দশটি সিড়ি পেরোনোর পর সেলোয়ার কামিজ পরিহিত জটাধারী এক যুবতী হাসিমুখে আহ্বান জানায়, আ-সু-ন, মাদারীপীর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তার আগে টিকেট সংগ্রহ করে নিতে হবে সামনের ঐ কাউন্টার হতে। আমি আপনার জন্যে এখানেই অপেক্ষায় থাকবো।

টিকেট এগিয়ে দিয়ে কাউন্টারের সন্যাসী লোকটি টুটুলকে লক্ষ্য করে বলল, আপনার মনের মানুষটির খোঁজ মাদারীপীরের কাছে পেয়ে যাবেন। আশা আপনার অপূর্ণ থাকবে না। এই বলে উদাস দৃষ্টি দূরে নিক্ষেপ করে সন্যাসী। যেন সে দিব্যচোখে দেখছে টুটুলের ভাবী

www.pathagar.com

বধুকে। চমকে উঠে সে লোকটির কথা শুনে! কে ওকে বলে দিল তার মনের মানুষটির খোঁজে সে মাদারীপীরের আস্তানায় এসেছে। একসময় এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজ থেকেই খুঁজে পায়। পূর্বেই তার সন্দেহ হয়েছিল, একে হয়তো কেউ আমার সমস্যার কথা ফোনে বলে দিয়েছে, অথবা এও হতে পারে টুটুলকে যে রাস্তা ধরে পাঠানো হয় সে রাস্তাটি এ ধরণের সমস্যার জন্যে নির্ধারিত। নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করে টুটুল। মনে মনে বলে, হায়রে জটাধারীরা, তোমরা হয়তো জান না, টুটুল একজন মনস্তত্ত্ববিদ না হলেও একজন পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার। আর তাই তো তোমাদের এই জটাকে ভেঙ্গে চুরে উদ্ভাবন করতে চাই এর ভেতরের সকল রহস্য, স্বগতোক্তি করে টুটুল।

ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে লোকটি। ঈশারায় এগিয়ে যেতে বলে। জটাধারী যুবতীকে অনুসরণ করে এগিয়ে যায় টুটুল সামনের পর্দাঘেরা অন্ধকার এক প্রকোষ্ঠের দিকে। ভারি কালো পর্দার অন্তরালে মোমবাতির মৃদু আলোতে কক্ষটির এক রহস্যময় পরিবেশ। ডানদিকের টানা বারান্দার দেয়ালে আঁকা বিরাট আকারের মাদারী গাছটিকে জীবন্ত মনে হয়। লাল লাল ফুলে ছেয়ে আছে গাছটির সমস্ত শাখা প্রশাখা। গুচ্ছ গুচ্ছ চুল জটলা পাকিয়ে যেন লেপটে আছে গাছটির সারা অঙ্গে। ডালে ঝুলছে এক মস্ত বড় অজগর। আগুন ঝরানো লাল দু'টো চোখ মেলে যেন তাকিয়ে আছে টুটুলের দিকে। যেন এখনই ফোঁস ফোঁস শব্দে তার মাথা বরাবর ঝাঁপ দেবে, বিষাক্ত ছোবলে জ্বালিয়ে দেবে সারা অঙ্গ। শিরশির করা এক প্রতিক্রিয়া বয়ে যায় টুটুলের সারা অঙ্গে।

জুতো খুলে ভেতরে প্রবেশ করুন। যুবতীটির দিকে একবার তাকিয়ে পর্দা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে টুটুল। হৃৎপিন্ডটি ঘড়ির পেন্ডুলামের মত শব্দ করে দুলছে এক অজানা আশঙ্কায় অথবা উত্তেজনায় যা টুটুল নিজেও জানেন না। ঘরটির অভ্যন্তরে লাল চাঁদোয়ার নিচে কালো পাতলা পর্দার ওপাশে মোমবাতির মৃদু আলোয় বসে আছে একটি নারীমূর্তি। ফোনে ফিস ফিস করে কার সাথে কথা বলছে। দু'পাশে রাখা কোলবালিশের মধ্যখানে নারীমূর্তিটি এবার একটু নড়ে উঠে। তার অদ্ভুত কণ্ঠ হতে পাক খেতে খেতে শব্দতরঙ্গ বেরিয়ে আসে পর্দা ভেদ করে, তুমি যার খোঁজে আমার কাছে এসেছো, সে তো তোমারই দুয়ারে অপেক্ষমান বাবা! দূরে আছ বলে এতদিন ওকে তোমার চোখে পড়েনি। যাও, ঘরে ফিরে যাও, কাল সকাল পর্যন্ত কারো সাথে অযথা কথা বলো না। তোমার মায়ের এমন একটি কনে পছন্দ হবে যে হবে তোমার জন্যে উৎকৃষ্ট। তবে বাপ, মা হারিয়েছে বলে মেয়েটিকে যদি অবজ্ঞার চোখে দেখো, তাহলে ফল হবে ভয়াবহ। আর দেরী করো না বাবা! ঘরে ফিরে যাও।

কথার ফাঁকে পর্দার ওপাশে কালো কাপড়ে আবৃত লম্বা দাঁড়িওয়ালা জটাধারী এক ছায়ামূর্তি নতজানু হয়ে নারীমূর্তিটির কানে ফিস ফিস করে বলে ওঠে-রাবী, আমি বিক্রমপুরে যাচ্ছি, ওখানের মাদারী গাছগুলোতে অসংখ্য ফুল ফুটেছে। ফেরার পথে তোর অজগরটিকেও নিয়ে আসব। দুধ কলা খেতে খেতে সাপটি অসম্ভব মোটা হয়ে গেছে। ওর এই বুড়ো বয়সে আর কত পাহারা দেবে তোর ভিটেমাটি ? ঈশ্বরতো তোকে কম দেননি, মাটির মায়া ছাড়তে পারিস না ?

www.pathagar.com

টুকরো টুকরো কথাগুলো টুটুলের কানের পর্দা ভেদ করে মগজে গিয়ে তাল পাকাতে থাকে। কাঁপতে থাকে টুটুলের সারা অঙ্গ। এখনই যেন পড়ে যাবে সে টাল সামলাতে না পেরে। স্মৃতির বেদীমূলে কে যেন প্রচন্ড আঘাত হেনে তার সমস্ত চেতনাকে অবশ করে দিয়েছে। পায়ের নিচের মাটি যেন কাঁপছে থর থর করে।

তাই হবে, তাই হবে এ কথা কয়টি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে ত্রস্ত পদে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসে টুটুল চারদেয়ালের বাইরে মুক্তাঙ্গনে। পেছন হতে তাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোন এক শক্তিধর তাপস। তাকাতে চায় না সে পেছন পানে। তাকালেই হয়তো ভয়ংকর বেগে কপালে অজগরটি ছোবল মারবে। প্রচন্ড ভয়ে ঘামছে টুটুল। হৃৎপিন্ডটা কাঁপতে কাঁপতে এখনই যেন বেরিয়ে আসবে। ফেরার পথে দেয়ালে টাঙ্গানো মাদারী গাছের ছবিটির দিকে একপলক তাকিয়েছিল সে। গাছের ডালে ঝুলন্ত সাপটি যেন বৃত্তের আকারে ঘুরপাক খেয়ে আসন পরিবর্তন করেছে এরই মধ্যে। টুটুলের মনে হল, ছবির মধ্যেও অজগরটি জীবন্ত।

ধানমন্ডির পাঁচ নম্বর রোডের ৪২ নং বাসার গেইটের সামনে এসে রিক্সাটির থামে টুটুলের নির্দেশে। ভাড়া মিটিয়ে বাসায় ঢুকেই সোজা নিজের রুমে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দেয় টুটুল। ছোট বোন নীলা এসে দরজার গায়ে ঠক ঠক আওয়াজ তুলে বলে, ভাইয়া! সারাদিন কোথায় ছিলে ? একটু দরজা খুলতো ?

না, এখন দরজা খোলা যাবে না। শুয়ে পড়েছি। পেটে ক্ষুধা নেই। বন্ধুর বাসায় খেয়ে এসেছি। কাল সকালে দেখা হবে। একটু শান্তিতে ঘুমাতে এসেছি। কাল সকালে দেখা হবে। হ্যাঁ, মা কোথায় রে?

নিউমার্কেটে গেছেন আংটি কিনতে তোমার হবু বউয়ের জন্যে। তোমার জন্যে খুশীর খবর আছে। এবার বোধ হয় আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মা কিন্তু খুব সিরিয়াস দুপুরে কারো সাথে আলাপের পর থেকে, বুঝেছ ?

এ পর্যন্ত মোট কতটি আংটি কেনা হল ? আর কত ? মাকে বলিস, এবার হতে আংটি না কেনে বিউটি বক্স কিনতে, হবু বউয়ের জন্য না হলেও তোর কাজে লাগবে। কি বলিস? এখন একটু একা থাকতে দে, আর বকবক করিস না। মাকে বলিস, মাথা ধরেছে, আমাকে যেন আর ডাকা না হয়, বুঝেছিস ? নীলার কাছে স্বাভাবিকতা সৃষ্টির নিমিত্তে গুছিয়ে কথাগুলো বলে টুটুল এক স্বস্থির নিঃস্বাস ফেলে।

নীলার হাসির তরঙ্গ ক্রমেই মিলিয়ে যায়। লাইট নিভিয়ে টুটুল বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। একরাশ ক্লান্তির পাহাড় যেন দেহকে বিবশ করে দেয়। চোখ মুদে ঘুমের পায়তারা করে। অন্ধকার কক্ষের বদ্ধ খাঁচায় সে যেন বন্দী পাখী। ক্রমেই রাত গভীর হয়। রাতজাগা পাখীদের কিচির মিচির আর হুতুম পেচার কান্নার শব্দ রাতের পরিবেশকে ভৌতিক করে তোলে। টুটুলের চোখে ঘুম নেই। ঘন কালো আবরণের খোলসে তন্দ্রাচ্ছন্ন রাতটি যেন পৃথিবীকে পেঁচিয়ে রেখেছে নিজের বাহুবন্ধনে। কনকনে ঠান্ডা বাতাস ভেন্টিলেটার দিয়ে প্রবেশ করে টুটুলকে শীতের জানান দিচ্ছে। লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাবার পায়তারা করে সে।

www.pathagar.com

মায়ের চিন্তাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। এ পর্যন্ত অনেক কনে দেখলেও পছন্দ হয়নি একটিও। অনন্যপায় হয়ে নিজের ক্লাসমেট দুজনের জন্য প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়ে নীলাও হাল ছেড়ে দিয়েছে। মা-র একই কথা- তোদের কাছে আমি তো টাকা পয়সা চাইনি, চেয়েছি মনের মত একটি ঘরের বউ। এটাও তোরা পারবি না ? হয়তো কাল সকালে টুটুলকে ধরে নিয়ে যাবেন কোথাও বউ দেখাতে, নিজের নারীশক্তি নিয়ে ভালভাবে পরখ করবেন বউয়ের মন, মেজাজ, চলাফেরা, আদবকায়দা কত কিছু। পছন্দ না হলে বলবেন, ঠিক আছে আমাদের মতামত পরে জানাবো। এর মানে পছন্দ হয়নি। মাকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা। পছন্দের সীমারেখা তাঁর কতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত মা ছাড়া কেউ তা জানে না। আরে বাবা, একটু ছাড় দিলেইতো হয়, নিজের পছন্দ যে একশোভাগ সঠিক হতেই হবে এমনতো কোন কথা নেই।

আজকের ঘটনা মাকে খুলে বললে কি হয় ? রাবীর কথা মনে পড়ে। কালো পর্দার অন্তরালে রাবীকে সে স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কৈশোরে দেখা রাবীর মুখচ্ছবি তার স্পষ্ট মনে আছে। কণ্ঠ ছিল গুরুগম্ভীর, পাড়ার ছেলেদেরকে কারণে অকারণে শাসাতো। কিন্তু আজকের কণ্ঠস্বর তার সম্পূর্ণ বিপরীত। না মেয়েলী আর না পুরুষালী। মাদারী পীর কি রাবীকে উভয়লিঙ্গে পরিবর্তন করেছেন, যে কারণে তার সুর পাল্টে গেছে। পর্দার অন্তরালে মুহূর্তের জন্য আলাপরত জটাধারী সে পুরুষটিকেও স্পষ্ট সে দেখতে পায়নি। কে সেই পুরুষ ? রাবীর সাথে তার কিইবা সম্পর্ক ? তবে কি কোনকালে ঝগড়া করে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া রাবীর স্বামী ? নতুবা ওর ভক্তদের মাঝে রাবীর নাম শীর্ষে কেন ? পাড়ার ছেলেরা পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে রাবীর বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছিল দীর্ঘ এক পুরুষকে। তাহলে সে-ই কি এ ? তাইবা কি করে হয় ? মাদারীপীরের আস্তানায় যাদের সাথে দেখা হয়েছে সবইতো জটাধারী সন্যাসী। টিকেট কাউন্টারে যার কাছে পাঁচশত টাকা ফিস দিয়ে নাম, ঠিকানা, পেশা লেখাতে হয়েছিল তার চেহারাও একই ধরণের। না, মাকে নির্লজ্জের মত বলতে সে পারবে না। নীলা শুনে হাসবে, হয়তো ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির ঝিলিক তুলে ব্যঙ্গ করে বল্লবে, মাকে একা দোষ দেই কি করে ? তুমিও তো বিয়ের জন্য কম পাগল নও ভাইয়া ? ইঞ্জিনিয়ার ছেলে শেষ পর্যন্ত বউ পাগল হয়ে পীরের মুরিদ হলে ? ছি, ছি, ভাইয়া! তোমার কাছ থেকে এতটা বাড়াবাড়ি আশা করিনি!

না, না, কাউকে একথা বলা যায় না। মা, নীলা কাউকে। এ অভিজ্ঞা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। জীবনের চোরাগলিতে হাঁটতে গিয়ে এমন কিছু জিনিসের সাথে মানুষের পরিচয় ঘটে যা কাউকে কোনদিন বলা যায় না। মনের গোপন প্রকোষ্ঠে সযত্নে লালন করতে হয় সে স্মৃতিকে আজীবন।

দরজায় করাঘাতে টুটুলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাইরে নীলার কণ্ঠস্বর। ভাইয়া! দশটা বাজে। আর কত ঘুমুবে ? মা তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। তাড়াতাড়ি ওঠো।

লেপ সরিয়ে টুটুল ওঠে দাঁড়ায়। গতরাতে কাপড় ছাড়া হয়নি। অজগরটি স্বপ্নের ঘোরে দুবার তার লেপের পাশে এসে ওর হাত পেঁচিয়ে ফনা মেলে হিস হিস করছিল লাল

www.pathagar.com

চোখ দু'টো মেলে। ঘুমের ঘোরে ওর বিশাল বপুকে সরাতে গিয়ে খাটের খুঁটির সাথে হাত লেগে জখম হওয়া কনুইটি ব্যথায় টনটন করছে।

বাথরুমে ঢুকে গোসল সেরে নেয় টুটুল। এক রাশ ক্লান্তিকে ধূয়ে, মুছে সতেজ হয়ে ফিরে আসে। নূতন একপ্রস্থ কাপড় গায়ে জড়িয়ে মায়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতেই মা বল্লেন, কি রে টুটুল, মাথাব্যথা সেরেছে ? তোর জন্যে বসে আছি, চল তোকে নিয়ে এখনই এক জায়গায় যেতে হবে। চা, নাস্তা তাড়াতাড়ি সেরে নে।

কোথায় মা ?

তেজগাঁয়ের এক ষ্টাফ কলোনীতে।

কথা বাড়ায় না টুটুল। মায়ের পরণে দামী শাড়ী। খুব মানিয়েছে। মা হয়তো কোন কনের সন্ধান পেয়েছেন। বিরক্ত হয় না সে। মায়ের জন্যে দুঃখ হয়। ছেলের জন্যে তিনি ঘুম হারাম করেছেন।

ঠিকানানুযায়ী তেজগাঁ ষ্টাফ কলোনীর ১২/এ-এর খোঁজ পেতে অসুবিধা হয় না টুটুলের। কলিং বেল টিপতেই বেরিয়ে আসেন এক বৃদ্ধ। সৌজন্য বিনিময়ের পর ড্রইংরুমে নিয়ে বসান। আরাম করে বসতে বলে ব্যস্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন।

ময়লা কোট গায়ে অন্য এক ভদ্রলোক এবারে মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এই কিছুক্ষণ আগে আমিও এসেছি। আপনার সাথে গতকাল ফোনে আলাপের পর সিদ্ধান্ত নিলাম আপনার ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটির জন্যে এ মেয়েটিই উপযুক্ত হবে। হোক না পিতৃ-মাতৃহীন, বাপ মা তো আর চিরদিন কারোর থাকে না। বলতে গেলে সন্তানহীন এই মামার কাছেই মেয়েটি মানুষ হয়েছে। এত ভাল মেয়ে এ তল্লাটে আর দেখিনি কি রূপে, কি গুণে! গত বছর খুব ভাল রেজাল্ট করে এম, এস, সি পাশ করেছে। এখনই আসবে। আমার কথা সত্যি কিনা একটু পরখ করেই দেখুন! জীবনে কত মেয়েকে পার করেছি, কিন্তু এমন গুণবতী মেয়ে এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

মা, ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, দেখুন আমার ছেলের জন্যে ধনসম্পদ বা যৌতুক কিছুই চাই না। তাছাড়া বাপ, মা নেই এটাও আমার কাছে বড় কথা নয়। আমি শুধু একটি মেয়ের মত মেয়ে চাই। ঘরের প্রথম ও শেষ বউ। সে হবে ভাল বংশের, শিক্ষিতা এবং সর্বগুণে গুণান্বিতা -ব্যস।

আলাপের মধ্যেই হাতে চা নাস্তার ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকে এক সুন্দরী যুবতী নত মস্তকে। কালো চাদরে মাথার অর্ধেক ঢাকা। সবাইকে সালাম করে কার্পেটে হাঁটু গেড়ে বসে আস্তে আস্তে কাপে চা ঢালতে থাকে আনমনে। মা এক বিচিত্র ভঙ্গিতে চেয়ে থাকেন মেয়েটির মুখের পানে। তার চোখের গভীর দৃষ্টি মেয়েটির আপাদমস্তক অতিক্রম করে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে কে জানে! এবার মুখ খুললেন, ঠিক আছে মা, তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমরা নিজেরাই এ সামান্য কাজটুকু করে নিতে পারবো। তা তোমার নাম কি মা ?

আমাকে সবাই টুলী বলে ডাকে। ধীর শান্ত কণ্ঠস্বরটি যেন নূপুরের রিনিঝিনি।

www.pathagar.com

বাহ ! খুব সুন্দর নামতো! এম,এস,সি তো পাশ করেছো শুনলাম। তা, এখন কি করবে বলে ভেবেছ ?

এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।

শুনলাম তোমার বাপ মা নেই, তাদেরকে মনে পড়ে ?

জী, না - তবে মামা আছেন যিনি আমাকে পিতৃস্নেহ দিয়ে বড় করেছেন। আমার সৃষ্টিকর্তা ও মামা যা করলে খুশি হবেন, আমি তা-ই করবো। চোখের কোণ মুছতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে মেয়েটি।

তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য একথা বলিনি মা। বাপ মা কারোর জীবনভর থাকেনা। তোমার পিতা-মাতা হয়তো কিছুদিন আগে চলে গেছেন, আমাদেরকেও এমনি একদিন চলে যেতে হবে - এটাইতো স্রষ্টার বিধান। মুরব্বীদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা দেখে বড্ড খুশী হলাম মা। মনে হচ্ছে, তোমার মত পবিত্র মনের একটি মেয়েকে আমি এতদিন ধরে খুঁজছিলাম ! এদিকে আসো মা, দেখি তোমাকে এ আংটিতে কেমন মানায় ? কেমন করে তোমাকে আদর করি বলতো ? এক জটাধারী সন্যাসীর কাছে ওই যে ওনার মত একজন ঘটকের সন্ধান না পেলে তোমাকে কি খোঁজে পেতাম মা ? তোমার মামাকে যে দেখছি না, উনি আবার কোথায় গেলেন ?

এতক্ষণ টুটুল নিরবে নতমস্তকে বসেছিল। মায়ের কথায় চমকে ওঠে। এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর যেন ধ্বসে গেল তার চোখের সামনে। মনে হল এক জটাধারী সন্যাসী ও ঘটকের রহস্যময় দূর্গে মাকে নিয়ে সে প্রবেশ করেছে নিজের অলক্ষ্যে। এখান হতে বেরিয়ে আসা যাবেনা তাদের আয়োজনকে অস্বীকার করে ! সাজানো, সবকিছুই রাবীদের সাজানো ! হ্যাঁ - তার ব্যাপারটিও নিখুঁতভাবে সাজিয়েছে হিউম্যান সাইকোলজিতে ডক্টরেট ঘটক ও জটাধারী রাবীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। পেশার খাতিরে ওরা সংঘবদ্ধ একটি দল বিভিন্ন মুখোশ পরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। তাইতো রাবীরা পারে রোগীর মধ্য হতে রোগের পথ্য সৃষ্টি করতে।

মামা ভদ্রলোককে কোথায় যেন সে দেখেছে কিন্তু মনে করে উঠতে পারছিল না। এবার মায়ের বুকে নেতিয়ে পরা টুলীর দিকে আড়চোখে তাকায় সে। টুলীর অনাবৃত সুন্দর হাতের আঙ্গুল পেঁচিয়ে আকিক পাথরের আংটির সাথে শোভা পাচ্ছে মার দেয়া সোনার আংটিটি। মার শুভেচ্ছার স্বীকৃতি। অকস্মাৎ চমকে ওঠে সে ! এমনি একটি অনাবৃত সুকোমল হাতের অঙ্গুলিতে আকিক পাথর খচিত একটি আংটি মুহূর্তের জন্য হলেও এর পূর্বে সে কোথাও দেখেছিল। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে পড়ছে- গতকাল মাদারীপীরের আস্তানায় যাওয়ার পথে ঠিক তারই সামনে চার পাঁচ হাতের ব্যবধানে মামা সদৃশ্য এক বৃদ্ধের সাথে ভীতসন্ত্রস্থ এক তরুণীর সুঢৌল হাতের অঙ্গুলিতে এ ধরণের একটি আংটি সে দেখেছিল। শুভ্র সুন্দর অনামিকায় আকিক খচিত আংটিটি দেখে বোরকাবৃত সেই তরুণীটির জন্য তার হৃদয়ের পুষ্টিত বাগানে মুহূর্তের জন্য প্রবল এক ভাললাগার ঝড়ও বয়েছিল।

www.pathagar.com

মা টুলীকে নিয়ে ততক্ষণে ব্যস্ত। কখনো বুকে চেপে ধরছেন, আবার কখনো হৃদয়ের সমস্ত মমতা মিশিয়ে ওর দীঘল কেশে বিলি কেটে দিচ্ছেন। টুলী মিশে আছে মায়ের বুকে। আনন্দাশ্রু ঝরছে ঝর্ণার মত ওর দু'চোখ ভাসিয়ে। রাবীর শেষ কথাটি মনে পড়ে, 'বাপ মা নেই এমন একটি মেয়েকে তোমার মায়ের পছন্দ হলে তাকে অবজ্ঞা করোনা বাবা, যদি করো তাহলে জীবন হবে ভয়াবহ'। কঠিন হয়ে ওঠে টুটুলের চোয়ালের দু'পাশের রগ দু'টো প্রবল এক উত্তেজনায়- হ্যাঁ, তাই আমি দেখতে চাই রাবী। তোমার সাজানো বাসরে প্রবেশ না করে সেই ভয়াবহ রূপটি একটিবার দেখে মরতে চাই কিন্তু পরক্ষণেই তার পৌরুষ হার মানতে বাধ্য হয় মায়ের উচ্ছ্বাসের কাছে।

টুলীকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত মায়ের মুখখানা যেন প্রশান্তিতে ভরে গেছে। মুখমন্ডল তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে গিয়েও পারে না টুটুল। পিতৃবিয়োগ হওয়ার পর একযুগ পেরিয়ে গেল, মাকে এমনভাবে প্রসন্ন হতে দেখেনি কতটি বছর। অস্পষ্ট ভাষায় বলে ওঠে, আমার সাধ্য কো-থা-য়, রাবী ? জটার মতই শক্ত তোমার সাজানো সকল আয়োজন, আর তাই তো বিষধর অজগরকে পুষে বছরের পর বছর তোমার ভাঙ্গা ঘরের পাহারাদার বানিয়ে রাখতে পেরেছো। পেরোছো এ ধরায় সকল জটাধারীদেরকে নিয়ে এক পূর্ণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ! তুমিতো রাজবংশী রাবী, আর সে রাজবংশের তুমিই একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী।

* * *

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

কথা সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার নজমুল চৌধুরীর জন্ম ১৯৪৯ সালে। পৈতৃক নিবাস হবিগঞ্জে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৬৯ সালে ডিগ্রী লাভের পর ১৯৭২ সাল হতে শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭২ সাল হতে দেশে সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। কাজে ইস্তফা দিয়ে ১৯৭৯ সালে তিনি সৌদিতে আসেন এবং সে অবধি জেদ্দাস্থ একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্বভার পালন করে আসছেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখালেখি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

প্রবাস জীবনের স্বল্পপরিসরেও তাঁর কলম থেমে যায়নি। ১৯৯৩ সাল হতে মধ্যপ্রাচ্যের নিয়মিত বহুল প্রচারিত সাহিত্য সাময়িকী 'সম্প্রীতি' প্রকাশনা ও সম্পাদনা ছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থেকে দেশে-বিদেশে সাহিত্যামোদীদের কাছে প্রচুর সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বৃহত্তম প্রচার মাধ্যম বিবিসি রেডিও-তে ১৯৯৮ সালের ১৮ই মে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। তাছাড়া সৌদিআরবের বিশিষ্ট দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা 'সৌদি গ্যাজেট'সহ বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়। সৌদিআরব, ভারত, বাংলাদেশ ও বৃটেনের বিভিন্ন সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়।

অন্যান্য প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ঃ

- লোহিতের তীরে
- জীবন জিজ্ঞাসা
- ফেরারী
- অভিশপ্ত নিলয়

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com